বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়-
সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩৫৬

মূল্য ৪৲ টাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ-লিখিত]

প্রত্যেক দেশের সভ্যতার এক একটি বিশেষ রূপ আছে। এই সভ্যতার রূপ দেশভেদে ভিন্ন হইলেও প্রত্যেক সভ্যতারই অসাধারণত্ব আছে। যে দেশবাসী যে সভ্যতার ক্রোড়ে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই সভ্যতাই তাহাদের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃপ্রদানে সমর্থ, ইহাই সেই সেই সভ্যতাভিমানী জনবৃন্দ শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। কিন্তু অল্পদিন হইতে ভারতবাসী ভারতীয়-সভ্যতায় কিছু আছে বলিয়া মনে করেন না। ভারতীয় সভ্যতার যাহা কিছু নিদর্শন বর্ত্তমানেও আছে, তাহা অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়াই বর্ত্তমানের তথা-কথিত শিক্ষিত ভারতবাসীরা মনে করেন। স্বীয় সভ্যতাতে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসীরা যেরূপ অশ্রদ্ধা পোষণ করেন, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের অধিবাসী তাহাদের স্বীয় সভ্যতায় এইরূপ অশ্রদ্ধাসম্পন্ন বলিয়া জানা যায় নাই। ভারত-বর্ষে বাস করিব অথচ ভারতীয় সভ্যতার সহিত কোন পরিচয় রক্ষা করিব না, ইহা ভারতের ভাড়াটেরা মনে করিলেও ভারতের যথার্থ অধিবাসীরা তাহা মনে করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে মনে হয়, ভারতের যথার্থ অধিবাসী অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের বিপুল জনতার মধ্যে যাঁহারা এখনও ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনগুলিকে অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন না, তাঁহাদের নিকটে "বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ" নামক পুস্তিকাখানি আদরের সহিত গৃহীত হইবে এবং ইহা তাঁহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করিবে।

এই পুস্তিকাতে ছোট ছোট ২৬টি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ-গুলি পূর্ব্বে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলির সকল লেখকই বর্ত্তমানে স্বর্গত ও স্বনামধন্য পুরুষ। যে সময়ে বাঙ্গালী বাংলার নানাবিধ পূজা-পার্ব্বণের সহিত নিজেদের সম্পর্ক স্বীকার করিতেন সেই সময়ে প্রকাশিত মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকা প্রভৃতিতে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। নানাবিধ উৎসব-যাত্রাদিতে যখন বাঙ্গালীর হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্রও আন্দোলিত হইত, নানাবিধ পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠান বাংলার হৃদয় স্পর্শ করিত, সেই সময়ে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধসমূহ সেই সময়ে বাঙ্গালীর হৃদয়ে পূজা-পার্ব্বণের

মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধ করাইয়া দিত। আজও বাংলার কিয়দংশ বাংলা নামেই প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে নানাবিধ পূজা-পার্ব্বণের অনুষ্ঠানও হয় কিন্তু সেই সমস্ত পূজা-পার্ব্বণের মহিমার উদ্দীপনের জন্য কোন শ্রেষ্ঠ লেখকই আর লেখনী ধারণ করেন না। বাংলার দুর্গাপূজার সময়ে যে সমস্ত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। দুর্গাপূজার সময়ে প্রকাশিত পত্রিকাদিতে সব কথাই থাকে কিন্তু দুর্গাপূজার মহিমা-সম্বন্ধে অতি সামান্য উল্লেখ থাকে। জাতীয় সভ্যতার নিদর্শন রূপে যে সমস্ত যাত্রা-উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত সেই দেশের জনতার যোগসূত্র ছিন্ন হইলে বুঝিতে হইবে সেই জাতি আর জীবিত নাই। বস্তুতঃ আজ বাঙ্গালী জাতি একটি মৃত জাতিতেই পরিণত হইয়াছে। এই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের কোন উৎসাহ, আনন্দ, উল্লাস আর অনুভূত হয় না। জড়যন্ত্রের ক্রিয়ার মত তাহার দৈনন্দিন কর্ম্মকলাপ নিঃসার হইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত বিষয়েই বাঙ্গালীর অসাধারণতা যেন বিলীন হইয়া যাইতেছে। সমস্ত ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, তাহার স্বীয় অতীত গৌরব সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মৃত হইতে পারিলেই যেন কৃতার্থতা আসিবে বলিয়া মনে করে। কোন ব্যক্তি যদি তাহার অতীত সম্পূর্ণ-ভাবে বিস্মৃত হইয়া যায়, তবে তাহার মত শোচ্য আর কেহই হইতে পারে না। পথচারী ভিক্ষুকও জানে তাহার কি আছে এবং কোথায় আছে; কিন্তু যাহার অতীতের সম্পূর্ণ বিস্মরণ হইয়াছে সে পথচারী অথবা বৃক্ষতলশায়ী ভিক্ষুক হইতেও অধিক শোচ্য। অতীতকেই অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যৎ প্রকাশমান হয়—অকস্মাৎ কোন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। একটি মানুষের মত একটি জাতিও যদি তাহার অতীত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া যায় তবে সে জাতিও যে শোচ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপোষণ করে অতীতের স্মৃতি। অতীতের স্মৃতি হইতে জাতি যাহাতে বিচ্যুত না হয় এজন্য সকল সভ্যসমাজ অতিশয় প্রয়াস করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র বাঙ্গালী বা ভারতবাসী যদি মনে করেন যে, আমাদের অতীত গৌরব-স্মরণের কোন আবশ্যকতা নাই তবে তাঁহারা স্বস্থচেতাঃ কিনা এই বিষয়েই পৃথিবীর লোকের সন্দেহ আসিবে এবং তাঁহারাও আকাশের বিচ্ছিন্ন অভ্রের মতই বিলীন হইয়া যাইবেন। ভবিষ্যতের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়া যাইবে। প্রত্যেক সভ্যতার আদর্শে এমন একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে যাহার প্রভাবে জাতির উচ্ছেদ হইয়া যাইতে পারে না। কোন জাতি তাহার সভ্যতার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে তাহার

উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী তাহার সভ্যতার নির্ম্মল আদর্শ হইতে যেন বিচ্যুত হইয়া না যায়, স্বীয় সভ্যতায় গৌরববোধ যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে স্বনামধন্য ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ৺পঞ্চানন তর্করত্ন, ৺বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষিবর্গ বাঙ্গালীর বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে সেই সেই পূজা-পার্ব্বণ-সম্বন্ধে বহু রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা, সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী, রথযাত্রা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি পূজা-পার্ব্বণানুষ্ঠানের উপযোগিতা বড় হৃদয়গ্রাহী করিয়া যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত বাঙ্গালীর হৃদয়পটে অঙ্কিত ও উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন। অনেকদিন পূর্ব্বে এই সমস্ত অমূল্য প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া কাগজের স্তূপের মধ্যে অনাদৃত ও অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। এই চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধরাশি পুস্তিকাকারে সংগ্রহ করিয়া সংগ্রহকার বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এইভাবে প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত না হইলে তাহা বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমগ্ন হইত। বাংলার সুশিক্ষিত স্বনামধন্য মনীষিগণ কি দৃষ্টিতে বাংলার পূজা-পার্ব্বণগুলিকে দেখিতেন তাহারও একটি ধারাবাহিক চিত্র এই পুস্তিকাতে রক্ষিত হইয়াছে। যে সমস্ত মনীষী এই প্রবন্ধগুলির লেখক তাঁহারা আজও শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র এবং ভবিষ্যতেও তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্রই থাকিবেন। এই পূজা-পার্ব্বণ-সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলি আলোচনা করিলে বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর চিত্তের গতি ও ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ-সম্বন্ধে সকলেই কিঞ্চিৎ পরিচিত হইতে পারিবেন। কালপ্রভাবে বিকৃত চিত্ত ব্যক্তিরও চিত্ত কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইবে। নানাপ্রকারে বাংলার পূজা-পার্ব্বণের স্বরূপ এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। পরপ্রতারিত, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পূজা-পার্ব্বণের মধ্যে কোন একটি স্থির সর্ব্বোদ্ভাসক তত্ত্বের সন্ধান না পাইয়া আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন রূপ দর্শন করিয়া মনে করেন—এই সমস্ত পূজা-পার্ব্বণ এই দেশের প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দের সাময়িক চিত্তবিলাসমাত্র, এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে সর্ব্বজনাভিলষিত কোন অসাধারণ তত্ত্ব নাই।

বর্ত্তমান সময়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে সমস্ত পূজা-পার্ব্বণ প্রচলিত আছে, যেমন জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি, এই সমস্ত পূজা-পার্ব্বণ এমন ভাবেই ব্যবস্থিত হইয়াছে যে, ইহার বাহ্যরূপ সাধারণভাবে সকলেরই চিত্তাকর্ষক। জনসাধারণ যে-জাতীয় আড়ম্বর-দর্শনে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকে, ভারতীয় জনতা যে-জাতীয় আড়ম্বরের সহিত স্বভাবতঃ পরিচিত ও আকৃষ্ট, এইরূপ আড়ম্বর

সমস্ত যাত্রা-উৎসবাদির বহিরাবরণ বা বাহ্যরূপ। স্বাভাবিক আসক্তিবশতঃই মানুষ এই আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রা-উৎসব প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—নানাবিধ লতাপুষ্পাদিতে ও দীপমালাতে সুসজ্জিত দেবগৃহ ধ্বজপতাকা, চন্দ্রাতপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত করা হয়; ধূনা, গুগ্‌গুল, চন্দন, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য-সমূহের সদ্‌গন্ধে পূজামণ্ডপ বাসিত করা হয়; বেণু, বীণা, মৃদঙ্গাদির মধুর শব্দে দেবগৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করা হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পক আড়ম্বর দ্বারা জনসাধারণ নির্বিচার বুদ্ধিতে অতি অনায়াসে কোন একটা দৈবভাবের সন্নিহিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সহসা দৈবভাবের সন্নিহিত হইতে পারে না। এজন্য নয়নাভিরাম, শ্রবণাভিরাম, দৃশ্যসমূহের সংযোজন যাত্রা-উৎসব প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর, পুরী, রামেশ্বর প্রভৃতির অসাধারণ কারুকার্য্যখচিত সু-উচ্চ দেবমন্দিরসমূহ যে নির্ম্মিত হইয়াছে, সে সমস্ত মন্দিরের দর্শনমাত্রেই দর্শকের চিত্ত বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া থাকে, এই সমস্ত মন্দির নির্ম্মাণেরও অভিপ্রায়—অতি অনায়াসে মানবচিত্তকে লৌকিক অন্য বিষয় হইতে বিমুখ করিয়া কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দৈবভাবের সন্নিহিত করা। চিত্তাকর্ষক বাহ্য আড়ম্বর না থাকিলে জনতার চিত্তকে সহসা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করা যায় না। এই আড়ম্বর যেমন বিলাসীর চিত্তকে ভোগে নিমগ্ন করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়, এইরূপ অলক্ষ্যে মানবচিত্তকে দৈবভাবের সন্নিহিত করিবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দৈবভাবের সন্নিহিত করিবার জন্য যে আড়ম্বর তাহা এই পূজা-পার্ব্বণ যাত্রা-উৎসবাদিতে প্রযুক্ত হয়। এই সমস্ত আড়ম্বর-রচনার বহুপ্রকার রীতি শাস্ত্রমুখে বর্ণিত হইয়াছে। স্বভাবতঃ মানবের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যসমূহকে শাস্ত্র দ্বারা সুমার্জিত করিবার অভিপ্রায় এই যে—দৃশ্যাবলীর রচনায় নৈপুণ্যপ্রযুক্ত যাহা মানুষের স্বভাবতঃ ভোগাকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থিত হইলে, মানবচিত্তকে ভোগতৃষ্ণার কবল হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। নৃত্যগীতাদি স্বভাবতঃই জনতার চিত্তকে ভোগের দিকে উন্মুখ করে; কিন্তু এই নৃত্যগীতাদিই আবার শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তসংযমের অসাধারণ সহায়ক হয়। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে বীণাবাদনে ও গীতিতে চিত্তসংযমের মহিমা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, যে কোন ব্যক্তি ভৈরবী রাগিণীতে গীত সঙ্গীত শ্রবণ করিলে সেই গীতিতে তাহার চিত্ত যেমন আকৃষ্ট হইবে তেমনই তাহা ভোগগন্ধশূন্য হইয়া জগজ্জননী মহামায়ার চরণ স্পর্শ করিবে। এইজন্য ভৈরবী রাগিণী বিলাসীর বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কখনও গায়কসমাজে গীত হয় না—ইহা একান্ত উপাসনারই বস্তু।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে দেবীমণ্ডপ-নির্ম্মাণের ও তাহা সুসজ্জিত করিবার রীতি নানা শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ বিদ্যাপতি-প্রদর্শিত রীতি-অনুসারে দেবীগৃহ সুসজ্জিত করেন তবে তাঁহারা সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে পারিবেন যে, আমরা সাধারণতঃ দুর্গাপূজায় প্রচলিত রীতি-অনুসারে দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যে ভাব অনুভব করি, তাহা হইতে অতি বিলক্ষণ ভাবের স্ফূর্ত্তি আমাদের হইবে। প্রচলিত পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতিতে হিন্দুজাতি যে সমস্ত প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করেন তাহাতেও এই অধঃপতিত ভারতবাসীর চিত্তে ক্ষণকালের জন্য, চিন্তা-পর্য্যায়ের অলক্ষ্যে এক সুবিশাল মহান্ আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপে শুক্লযজুঃসংহিতার ২২শ অধ্যায়ের ২২শ মন্ত্রটি বলা যাইতে পারে। "আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তামারাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যো অতিব্যাধী মহারথো জায়তাম্" ইত্যাদি, ইহার অর্থ—হে ব্রহ্মন্, হে ভগবন্! এই রাষ্ট্রে ব্রহ্মবর্চসী ব্রাহ্মণসকল উৎপন্ন হউক, এই রাষ্ট্রে মহারথ, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ মহাশূর ক্ষত্রিয়সমূহ উৎপন্ন হউক, দুগ্ধবতী ধেনুসমূহ, মহাবলশালী বৃষসমূহ, অতি বেগশালী অশ্বসমূহ এই রাষ্ট্রে উৎপন্ন হউক, গৃহকর্ম্মে নিপুণা রমণীসমূহ এই রাষ্ট্রে উৎপন্ন হউক। জয়শীল যুদ্ধেচ্ছু মানবসমূহ জন্মগ্রহণ করুক। আমাদের মেঘ প্রয়োজনমত বর্ষণ করুক, ধান্য-গোধূমাদি শস্য প্রচুর উৎপন্ন হউক। আমাদের যোগক্ষেমলাভ হউক।" প্রচলিত দুর্গাপূজাতেও সপ্তমী পূজার দিনে ঘটস্থাপন করিয়া ঘটে ব্রহ্মার পূজা হইয়া থাকে। এই মন্ত্রটি রাষ্ট্রবৃদ্ধিকর মন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী"তে রাষ্ট্রবৃদ্ধিকর ব্রহ্মার পূজা এই মন্ত্রেই করিতে বলিয়াছেন। আমরা মনে করি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য আবার দেবতার পূজা কি? দেবপূজায় বিশ্বাসী হিন্দুরাও মনে করেন ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য দেবতার পূজা আবশ্যক বটে! কিন্তু রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য আবার দেবতার পূজা কি? কিছুদিন হইল আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকে "রাষ্ট্রীয় কল্যাণ" শব্দ দ্বারা ব্যবহার করিলেও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ শব্দের অর্থ কি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে? যাহাদের সমস্ত কার্য্যই ব্যক্তিগত কল্যাণ-সাধনের জন্য, তাহারা রাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে ইহা কি কখনও সম্ভব! যখন ভারতে ভারতবাসী ছিল তখন ভারতের কল্যাণের জন্য দেশ-বৃদ্ধিকর মন্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল। আজ সমস্তই ভারতের ভাড়াটে—ভাড়াটে লোক সেই দেশের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করে না। এজন্য আজ প্রচলিত দুর্গা-পূজাতে দেশবৃদ্ধিকর মন্ত্রে ব্রহ্মার পূজাও হয় না।

বাংলায় ষষ্ঠিপূজা অতি প্রচলিত। বাংলার বাহিরেও এই পূজার প্রচলন আছে। জননীরা সন্তানের কল্যাণ কামনা করিয়া ষষ্ঠিদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। এই পূজায় ষষ্ঠিকে বলা হইয়াছে যে "অঙ্কাপিতসুতাং ষষ্ঠীম্।" ইহার অর্থ মা ষষ্ঠির কোলে সন্তান সুখসুপ্ত রহিয়াছে। সন্তান কোলে লইয়া মা ষষ্ঠি বিরাজমানা। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ নহে যে যিনি ষষ্ঠির অর্চ্চনা করেন মাত্র তাঁহারই সন্তানটি মা ষষ্ঠির কোলে সুখে অবস্থিত রহিয়াছে, পাড়ার অন্য মায়ের ছেলেরা নানাবিধ রোগে ও ক্ষুধায় জীর্ণ হইয়া ভূমিতে বা কাদায় লুণ্ঠিত ও মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সমস্ত মায়ের ছেলেরাই মা ষষ্ঠির কোলে আশ্রয় পাইয়াছে। কেহই ষষ্ঠী কর্ত্তৃক উপেক্ষিত নহে। সমস্ত জননীর সন্তানই যদি মা ষষ্ঠির কোলে সুখবিশ্রান্ত, তবে তাহাদের মধ্যে ষষ্ঠীর অর্চ্চনাকারিণী মাতার সন্তানকেও ষষ্ঠির কোলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সমস্ত সন্তানের কল্যাণ-কামনাপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানের কল্যাণ-কামনার জন্য মাতা ষষ্ঠীর অর্চ্চনাতে নিরত হইয়া থাকেন। সকলের কল্যাণ-প্রার্থনাপূর্ব্বক নিজের কল্যাণ-প্রার্থনা ভারতের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারতের মুমুক্ষুও যখন ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে গুরু এই উপদেশ করেন—"ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা, তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতো।" ইহার অর্থ, "সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক, আর তাহাই একমাত্র পরমার্থ সত্য। এই ব্রহ্মই সমস্ত জীবের আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও ব্রহ্মস্বরূপ।" এ স্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই তুমিও ব্রহ্মাত্মক। সমস্ত বিশ্ব নরকে নিমগ্ন রহিল কেবল তুমিই ব্রহ্মভাব লাভ করিলে এইরূপ উপদেশ ভগবতী শ্রুতি করেন নাই। সমস্ত জগতের কল্যাণ-কামনাপূর্ব্বক নিজের কল্যাণ কামনাই হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আবার কোন স্থলে এরূপও দেখা যায় যে, প্রার্থয়িতা সমস্ত জগতের কল্যাণ কামনা করিয়াই বিরত হইয়াছেন আর পৃথগ্‌ভাবে নিজের কল্যাণ কামনা করেন নাই। যেমন মহাভারতে ""সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি, সবের্বা ভদ্রাণি পশ্যতু" বলিয়াই প্রার্থয়িতা বিরত হইয়াছেন। হিন্দুর প্রত্যেক পূজা-পার্ব্বণ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অন্যের জন্যও কিছু করিবার আছে; অন্যের কল্যাণের কোন ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র নিজের কল্যাণের জন্য কোনও পূজা অনুষ্ঠিত হয় না। হইলে তাহা নিজেরও কল্যাণপ্রদ হয় না। প্রত্যেক পূজা-পার্ব্বণেই সাধারণভাবে অনুষ্ঠাতা দেবসান্নিধ্য অনুভব করিয়া থাকেন। দেবভাবের অনুকরণেই মানুষের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। সমস্ত পূজা-পার্ব্বণই যে দেবভাবের অনুকরণ শ্রুতি তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ইদম্ অহম্

অনৃতাৎ সত্যম্ উপৈমি।" এই যজুর্মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে শতপথ শ্রুতি বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের প্রারম্ভে যজমান যে এই মন্ত্রটি পাঠ করেন তাহার অভিপ্রায় এই "আমি যজমান, মনুষ্যভাব হইতে দেবভাবে উপনীত হইলাম।" নিজের মধ্যে দেবভাবের স্ফূর্ত্তি ভিন্ন কখনও মানুষ দেবসান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না। যিনি যাঁহার সান্নিধ্যলাভে অভিলাষী তাঁহাকে তাঁহার অনুকরণ অবশ্য করিতে হইবে। দেবতা পরার্থবৃত্তি, দেবতার স্বার্থ বলিয়া কিছু নাই—জীবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সম্পাদনই দেবতাদের একমাত্র ব্রত। পরার্থবৃত্তি, দেবতার সান্নিধ্য, মাত্র স্বার্থান্বেষী লাভ করিতে পারে না। মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। পরার্থবৃত্তি দেবতার সান্নিধ্য ক্ষণকালের জন্যও লাভ করিলে স্বার্থতৃষ্ণার ক্ষণিক বিচ্ছেদে জীবের মহান্ উপকার হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর ধারণা অতিমাত্র বিকৃত হইয়াছে বলিয়া দেবতারা যে পরার্থৈকবৃত্তি এই কথাই ভাবিতে পারে না। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ প্রভৃতি দেবতার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেবতারা যে পরার্থৈকবৃত্তি ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। যে সমস্ত দেবতার নাম উল্লেখ করিলাম, বেদ এই সমস্ত দেবতার মহিমার দ্বারাই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রের অনুশীলন না থাকায় আমরা দেবতাদিগকে জড়বস্তু বলিয়া মনে করি। যাস্ক-প্রণীত নিরুক্ত গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে দেবতত্ত্ব-সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বৃক্ষ, তৃণ, ওষধি প্রভৃতি, বিশেষ বিশেষ পুরুষার্থ-লাভের জন্য বেদমন্ত্র দ্বারা স্তুত হইয়া থাকে। আমাদের নিকটে যে সমস্ত বস্তু নিতান্ত অচেতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাদেরও স্তুতি বেদমন্ত্রে বহুধা আম্নাত হইয়াছে, যেমন রথ, দুন্দুভি, ইষুধী (তূণ), ধনুঃ, জ্যা, ইষু, উদূখল, নদী, জল, ওষধি, রাত্রি, অরণ্যানী প্রভৃতি। এই সমস্ত জড়বস্তু বেদমন্ত্র দ্বারা স্তুত হইল কেন, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, অচেতন বস্তু বেদমন্ত্রে স্তুত হয় নাই। অচেতন তো স্তুত হয়ই নাই, অদেবতাও স্তুত হয় নাই। বস্তুতঃ নানা দেবতাও স্তুত হন নাই। যাস্ক বলিয়াছেন, "মাহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে"—মহা-ঐশ্বর্য্যশালিনী মহাভাগা দেবতা মহান্ আত্মা স্বীয় ঐশ্বর্য্যযোগে বহুভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন; রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি, ঋক্‌সং ৩।৩।২০, এইরূপ—একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, ঋক্‌সং ২।৩।২২। প্রদর্শিত দুইটি ঋক্‌মন্ত্রে একই মহান্ আত্মা বহুভাবে স্থিত আছেন বলিয়া মন্ত্রে দেবতারূপে যিনিই স্তুত হইয়াছেন, সেই সমস্ত স্তুতিই সেই এক মহান্ আত্মার। আবার যাস্ক বলিয়াছেন, সমস্ত বস্তুরই উপাদান, সেই এক্ মহান্ আত্মা, তিনিই সমস্ত বস্তুর প্রকৃতি। উপাদেয় উপাদান

হইতে ভিন্ন নহে, এজন্য যাহা অচেতন ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীত হয়, তাহাও সেই এক মহান্ আত্মা হইতে অভিন্ন। আর সেই মহা-ঐশ্বর্য্যশালিনী দেবতার সহিত ক্ষুদ্র বস্তুরও অভেদ আছে বলিয়াই ক্ষুদ্র বস্তুও স্তুত হইয়া থাকে। এই মহান্ আত্মাই হিরণ্যগর্ভ। "স এষ মহান্ আত্মা সত্তালক্ষণঃ, তৎ পরং, তদ্ ব্রহ্ম, স ভূতাত্মা, সৈষা ভূতপ্রকৃতিঃ"। ক্ষুদ্রবস্তুও স্বীয় প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া আমাদের নিকটে ক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত হইলেও স্তুতিকর্ত্তার নিকটে মহা-ঐশ্বর্য্যশালিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কারণের মহিমার দ্বারা কার্য্য মহিমান্বিত হইয়াছে। আবার যাস্ক বলিয়াছেন, "আত্মৈবৈষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্ব আত্মা আয়ুধম্, আত্মা ইষবঃ আত্মা সর্বং দেবস্য দেবস্য।" এইরূপ আরও কত অসংখ্য কথা যাস্ক দেবতাতত্ত্ব-বিশ্লেষণের জন্য বলিয়াছেন। আজ আমাদের তাহা দেখিবার মত অবসরও নাই। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ এই দেবতাতত্ত্ব-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, হিন্দুর যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এগুলি দেখিয়া কি বলিয়াছেন, তাহাও আমরা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বিচারপূর্ব্বক দেখিবার অবকাশ পাই না। সমস্ত দিকেই সমস্ত বিষয়েই আমাদিগকে ঘোর অবসাদ গ্রাস করিয়াছে। আমাদের সম্মুখে যে কিছু সমস্যা আসে, নিতান্ত অবসন্নভাবেই তাহার যাহা-কিছু-একটা সমাধান করিয়া আমরা নিশ্চেষ্টভাবে বাঁচিয়া আছি। আমাদের এই ভাব অদূর ভবিষ্যতে আমাদের উচ্ছেদেরই সূচনা করে।

বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাংলার স্বনামধন্য লেখকগণ বাংলায় প্রচলিত পূজা-পার্ব্বণে নূতন উদ্দীপনা জনতার মধ্যে সঞ্চার করিবার জন্য সময়োপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এগুলিকে একত্র সঙ্কলিত করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি এইরূপ আশা পোষণ করি যে যিনি এই পুস্তিকা পাঠ করিবেন, বাংলার প্রচলিত পূজা-পার্ব্বণগুলিকে তিনি নূতন আলোকে দেখিবেন এবং এই প্রচলিত পূজা-পার্ব্বণগুলি তাঁহার নিকটে আর পূর্ব্বের মত নিঃসার বলিয়া বোধ হইবে না। ইহাদের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি নিজেও বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

৯ই ভাদ্র, সন ১৩৫৬

সম্পাদকের বক্তব্য

এই পুস্তকে প্রকাশিত, মনীষী-প্রধান বিপিনচন্দ্রের লিখিত "বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব" নামক প্রবন্ধের প্রথমেই আছে—"প্রাচীনেরা দুর্গাকে যে চক্ষে দেখিতেন, সে চক্ষু আমরা হারাইয়াছি।" অনেকেই জানেন, বিপিনচন্দ্র নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই বাক্যের মধ্যে আমরা সাকার-উপাসক হিন্দুরই মর্ম্ম-বেদনা শুনিতে পাই। আমার মনে হয়, তাঁহার এই উক্তি, শুধু দুর্গা কেন, আমাদের অন্যান্য পূজা-পার্ব্বণের প্রতি প্রয়োগ করিলেও কিছুমাত্র অন্যায় বা অসঙ্গত হয় না। সম্প্রতি 'সর্ব্বজনীন পূজা'র প্রচলন-বৃদ্ধি দেখিয়া যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধি আবার জাগিতেছে, তাহা হইলে নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যেখানে কেবল আমোদ-প্রমোদ-উপভোগের প্রবৃত্তি ও প্রমত্ততা সুপ্রকট, সেখানে ধর্ম্ম-বুদ্ধির জাগরণ-সম্পর্কে কোনও কথা মনে না আনাই ভাল। যেখানে প্রতিমা-প্রস্তুতির মধ্যে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রকাশ-প্রচেষ্টার পরিবর্ত্তে তথাকথিত আর্টের বাহার-বিড়ম্বনা ফুটিয়া উঠে, সেখানে যাহা হয়, তাহা পূজা নহে—পূজার বিদ্রূপাত্মক অভিনয় মাত্র। এই খোস্‌-খেয়ালের খেলা প্রায় সর্ব্বত্র চলিতেছে। তাই প্রতিবৎসর পূজার সময়ে আমরা মায়ের আগমন-বার্ত্তা চাঁদের আলোয়, সূর্য্যের কিরণে, গাছের পাতায়, ভ্রমর-ঝঙ্কারে এবং ছুটির আমোদে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহাই গদ্যে ও পদ্যে প্রচার করিয়া থাকি। কিন্তু দাশরথিকে আমরা অনেকে কবি বলিতে সঙ্কোচ-বোধ করিলেও, তিনি একদিন আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল!
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল।"

এই প্রকার ভাবের মুখে মায়ের আগমন-সমাচার দেশবাসীকে এখন আর আমরা শুনাইতে পারি না। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে, বলিতে হয়—যে ভক্তি ও ভাব-সাধনা প্রাচীনের ছিল, আমাদের তাহা নাই। প্রাচীনের চক্ষু আমরা সত্যই হারাইয়াছি।

কেন এমন হইল? প্রাচীনের ভাব-পারম্পর্য্যের প্রবাহ কিসের প্রভাবে প্রতিহত হইল? কবে হইতে ইহার আরম্ভ? প্রাচীনপন্থীরা সে-সময়ে কি করিয়াছিলেন? ক্রমশঃ কত রকম ভাবের তরঙ্গ কত রকম ভঙ্গীতে দেখা

দিয়াছিল? সেই দারুণ ভাব-দ্বন্দ্বের দিনে কাহার সমন্বয়-বাণী বহু বঙ্গবাসীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল?—এই সব প্রশ্নের বিচার-বিশ্লেষণপূর্ব্বক সবিস্তারে উত্তর দিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। অদ্যাবধি সে প্রকার পুস্তক প্রণীত হয় নাই। যদি কখনও হয়, তবে সেই গ্রন্থকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া মনে করিব। আমি শুধু সেই ইতিহাসেরই কয়েকটি মূল কথা এখানে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়াস পাইব। কারণ, তাহা না জানিলে বা না বুঝিলে, এই পুস্তকান্তর্গত অধিকাংশ প্রবন্ধেরই অনেক কথা কিসের প্রতিক্রিয়া, কাহার বা কাহাদের প্রত্যুত্তর, তাহা এখনকার অনেক পাঠকই ঠিকমত বুঝিতে পারিবেন না।

মুসলমানের আমলে অনেক হিন্দুকে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে ঘটনার মূলে প্রলোভন বা উৎপীড়ন ভিন্ন অন্য কোনও কারণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর ধর্ম্মকে 'ভূত-প্রেতের ধর্ম্ম' ভাবিয়া কোনও হিন্দু যে মুসলমান হইয়াছিল, এমন কথা শুনা যায় না। মুসলমানেরা হিন্দু-দেবতার বাহ্য মূর্ত্তিই ভগ্ন করিয়াছিল, কিন্তু সনাতন ঋষি-বাক্যকে বিকৃত করিয়া দেবতার প্রাণে আঘাত করিতে পারে নাই। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালার কোনও হিন্দুই বোধ হয় স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, তাহাদেরই বংশধরেরা একদিন বেদকে 'আদিম কালের কৃষকের গান' বলিবে, পুরাণসমূহকে 'গাঁজাখুরি গল্পের সংগ্রহ-গ্রন্থ' বলিয়া উপহাসের হাসি হাসিবে এবং হিন্দুর স্মৃতি ও দর্শনকে 'অসার, রন্ধ্রপরিপূর্ণ নিতান্ত শূন্যগর্ভ' ভাবিয়া 'ক্লেশানুভব' করিবে। এই প্রকার সিদ্ধান্তের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া যদিও ঈশ্বর গুপ্ত একদিন বলিয়াছিলেন—"বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।" কিন্তু 'সহজ জ্ঞান' (conscience), 'স্বাধীন চিন্তা' প্রভৃতি কথার মোহে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ সে-সময়ে সমাচ্ছন্ন; সুতরাং গুপ্ত-কবির কথা কে শুনিবে? ঐ কথা দুইটার দোহাই দিয়া এদেশের 'সাকার-পূজা,' 'সতীত্ব' প্রভৃতি কত সুসংস্কারকে যে 'কুসংস্কার' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া বলা সুকঠিন।

পলাশীর যুদ্ধের প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' লিখিয়াছিলেন। এই কাব্য-গ্রন্থের একস্থানে আছে—মুসলমান পাতশাহ কর্ত্তৃক সাকার-পূজার নিন্দা শুনিয়া তাহার পাল্টা জবাবে মজুন্দার বলিতেছেন—

"সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥"

কিন্তু এই 'সোণা ফেলি, কেবল আঁচলে গিরা' দেওয়াটাই যে পারমার্থিক সত্য ও শ্রেষ্ঠ সভ্যতার পরিচায়ক, এ কথা প্রথম ভাবিতে শিখিলাম আমরা ইংরেজের আমলে এবং ইংরেজেরই নিকটে। যদিও রাজা রামমোহন-প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্যপ্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গা-স্রোতের উপর এই সমাজ-রূপ জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন।" কিন্তু ইতিহাস এ কথায় সায় দিবে না। 'পৌত্তলিক,' 'পুত্তলিকাতে পূজা' প্রভৃতি শব্দ পাদ্রী-সাহেবদেরই সৃষ্টি। এদেশের লোককে 'অন্ধকার হইতে আলোকে' আনিবার অজুহাতে কেরী-প্রমুখ ইংরেজ পাদ্রীগণই সর্ব্বপ্রথম হিন্দুর দেব-দেবী, পূজা-পার্ব্বণ, সাধন-ভজন প্রভৃতিতে কুৎসার কালি মাখাইতে আরম্ভ করেন। এই কুৎসার কালি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা হিন্দুর পক্ষ হইতে যে তখন আদৌ হয় নাই, অবশ্য তাহা নহে। কিন্তু ইংরেজ জাতি যে আমাদের অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, এ ধারণা ধীরে ধীরে এদেশ-বাসীর অনেকেরই মনে তখন বদ্ধমূল হইতেছিল। কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বোধ হইলে তাহার আনুগত্য করিতে ইচ্ছা হয়, তৎপ্রতি অনুচিকীর্ষার ভাব হয়। আমাদেরও তাহাই হইয়াছিল। সুচতুর ইংরেজ-পাদ্রীরা আমাদের এই মনের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়াই আমাদের পূজা-পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। ইহার ফলে, শুধু যে একদল 'দিনে কৃষ্ণ, রেতে খৃষ্ট-ভজা'র প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে খৃষ্ট-ভক্তের সংখ্যা সত্যই কিছু বাড়িয়াছিল, এবং কেহ কেহ সাকারবাদের প্রতি বীতরাগ হইয়া খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণও করিয়াছিলেন।

খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের এই প্রবল প্রচলন-কালেই 'ব্রাহ্ম-সাহিত্যে'র উৎপত্তি হয়। রাজা রামমোহন ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিও সাকার-পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। খৃষ্টান-মিশনরিগণ বাইবেলের দোহাই দিয়া যাহা বলিতেছিলেন, রামমোহন বেদান্তের দোহাই দিয়া কতকটা তাহাই বলিতে লাগিলেন। তাঁহার রচনাবলীর নানা স্থানে হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি বিষম আক্রোশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতেও "যীশুখৃষ্টের গেয় গীতে"র কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার প্রশংসা-প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়া গিয়াছেন—"দুর্গোৎসবের সময় যখন বিবিধ সাজে প্রতিমা সাজাইয়া লোকে বিসর্জন করিতে যাইত, তখন তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে যদি কেহ বলিতেন—'দেওয়ানজী, দেখুন দেখুন, কেমন প্রতিমা সাজাই-য়াছে।' অমনি তিনি বলিতেন—'Brother, brother, ours is

universal religion' অর্থাৎ 'ভাই, ভাই, আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।' বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনা গিয়াছে, এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত। ইংলণ্ডে বাস-কালে যখন খৃষ্টীয়দিগের ভজনালয়ে যাইতেন এবং তাঁহারা যখন ভজনা করিতেন, তিনি একান্তে বসিয়া কাঁদিতেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—'দেশের লোকের কথা মনে করিয়া কাঁদিতেছি, কতদিনে তাহারা ভ্রম কুসংস্কার দূর করিয়া উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে!" —বিলাতে বিধর্ম্মীর ভজনালয়ে স্বজাতির 'কুসংস্কার'-স্মরণে রামমোহনের ন্যায় প্রতাপ-প্রতিপত্তিশালী পুরুষের এই রোদন তখনকার 'ভারত-হিতৈষী' ইংরেজদিগকে খুব সম্ভব খুব খুসীই করিয়াছিল। জেম্‌স ষ্টুয়ার্ট যদি সে সময়ে বলিতেন যে, তাঁহার 'তমোনাশক' গ্রন্থ লেখা সার্থক হইয়াছে, তবে মনে হয় তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইত না। যাহা হউক, আসল কথা এই যে, "অজস্রপ্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ" রামমোহন যেমন করিয়াছিলেন, তখনকার প্রসিদ্ধ পাদ্রীরাও তেমনি করিয়াছিলেন। এবং এজন্য ইংরেজেরাও জয়-মাল্য-লাভের দাবী করিয়া থাকেন।

ইংরেজদিগের এই দাবী যে একেবারে অস্বীকার্য্য, অবশ্য তাহা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে করা যায় যে, কোনও খৃষ্টান কিংবা রামমোহন রায় "পৌত্তলিকতার সহিত যুদ্ধ" করিতে গিয়া তর্ক-যুদ্ধে পৌত্তলিকদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ভুল হইবে। বরং বলা চলে, রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষ হইতে 'ঈশ্বর সাকার,' 'প্রত্যুত্তর,' 'বেদান্ত চন্দ্রিকা[illegible],' 'জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা,' 'খৃষ্টীয়ান মর্ম্ম প্রকাশিকা' প্রভৃতি যে-সব প্রতিবাদমূলক গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির সদুত্তর কেহ দিতে পারেন নাই। নাম ও রূপের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত যে উপাসনা-পদ্ধতি, তাহাকে এক কথায় 'ভ্রম' বা 'কুসংস্কারপূর্ণ' বলিলে তাহা সদুত্তর হয় না। কিন্তু এইরূপ কথা আমরা রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় মনীষীর নিকট হইতেও শুনিয়াছি। তাঁহার 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তকের একস্থানে আছে—"খৃষ্টানেরা বলে, হিন্দুরা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির পূজা করে, তাহার দ্বারা তাঁহারা ঈশ্বরের পূজা করে না—শয়তানের পূজা করে। শয়তান ঐ সকল দেবতার ভিতরে বাস করে। এ সকল কথা নিতান্তই অসঙ্গত ও অনৌদার্য্যপ্রসূত। যাহারা পুত্তলিকার পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া পূজা করে। নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর উপাসনা করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু পৌত্তলিকদিগের পৌত্তলিকতা পাপকর্ম্ম নহে, তাহা কেবল ভ্রম মাত্র।"

ভূদেববাবু ইহাকেই "ইংরাজী কলেজের বিষে"র ফল বলিয়াছেন। ভূদেব, রাজনারায়ণ ও মধুসূদন—এই তিন জনই শৈশবে সহপাঠী ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, এই "সময়ে কোন-কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।" বলা বাহুল্য, এই ভাঙ্গিবার পন্থাবলম্বনকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়াই কৃতবিদ্য রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন এবং কৃতবিদ্য মধুসূদন খৃষ্টান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ভূদেব এই বিপ্লব-ব্যাধির নিদান-নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার বন্ধুর লিখিত পুস্তক-পাঠে বলিতে পারিয়াছিলেন—"গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এইমাত্র দেখাইয়াছেন যে, উহা ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত মিলে—গ্রন্থকর্ত্তার মনের মানদণ্ড ইংরাজ।... ইংরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়।"

এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, "ইংরাজী শিক্ষার এই বিষে"র কথা মাইকেল মধুসূদনও পরে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উপলব্ধির অভিব্যক্তি আমরা তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা'র মধ্যে দেখিতে পাই। এই প্রহসনে কোনও এক পাত্রের মুখ দিয়া বক্তৃতার ছলে তিনি বলাইয়াছেন,—"জেন্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিষ্টিসনের শিক্‌লি কেটে ফ্রী হ'য়েচি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক ক'রে, এদেশের সোসিয়াল রিফরমেসন যাতে হয় তার চেষ্টা কর। (হিয়ার, হিয়ার)"—এ ধরণের কথা কিন্তু কখনও কোনও ব্রাহ্ম লেখকের লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। বরং দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কথায় 'সাকার'-সম্পর্কিত কোনও শব্দের একটু গন্ধ পাইলেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। বলিতে কি, এজন্য তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই এক সময়ে বিষম বাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। উদাহরণ ব্যতীত যাঁহারা এ কথা বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহাদের জন্য ১২৮১ সালের "সমদর্শী" পত্রিকায় প্রকাশিত শিবনাথের একটি রচনা হইতে স্থলবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ তাঁহার 'প্রকৃত ব্রাহ্মের আদর্শ' নামক বক্তৃতাতে উন্নতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগের প্রযুক্ত কতকগুলি কথার প্রতি বিশেষ আপত্তি করিয়াছেন। এমন কি, বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একটি সুবিখ্যাত উপদেশকেও তিনি সাধারণের সমক্ষে অতি হেয় ও কদর্য্যভাবে উপস্থিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

সেই উপদেশ যখন ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তাহার মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত আছে, তাহা অনুভব করিয়া, তখন অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি নাই ; এবং তাহাতে আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বরের পরিত্রাণ-ব্রতের যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা আজিও হৃদয়ে মুদ্রিত আছে। রাজনারায়ণ বাবু এক ভাষা মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া সেই হৃদয়ভেদী বক্তৃতাটিকে অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে উপহাস না করিলেই ভাল করিতেন।" আবার এই প্রবন্ধেরই আর একস্থলে আছে—"আকার-বিশিষ্ট পদার্থের সহিত যে-কথার অত্যন্ত যোগ, তাহা পারতপক্ষে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। 'দাঁড়াও বক্ষঃস্থলে' 'পদধূলি গায়ে মাখি' প্রভৃতি বাক্যাবলী ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।"—ইহা অবশ্য তর্কের কথা। যুক্তিবাদীর মতে ঐরূপ "বাক্যাবলী ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত" হয়ত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে ভক্তি-সঙ্গত, এ কথা কেশবচন্দ্রের বাক্-বিভূতির প্রভাবে অনেক ব্রাহ্মই ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। "ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম্মকে ভক্তি-ধর্ম্মে পরিণত" করিবার প্রচেষ্টা তিনিই প্রথম করেন। তাঁহারই প্রভাবে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ভক্তিমূলক ব্রহ্ম-সঙ্গীত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা-মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই—"আমার মাথা নত ক'রে দাও হে, তোমার চরণ-ধূলার তলে।" নিরাকার ব্রহ্মের শুধু 'চরণ' নহে, সেই চরণের 'ধূলা'র কথা পর্য্যন্ত এখানে বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, এ কথা পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আদি সমাজ পরিত্যাগের পর কেশবচন্দ্র যখন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' স্থাপন করেন, তখন হইতেই এদেশে ধর্ম্মের আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। হিন্দু ও ব্রাহ্ম, উভয় পক্ষ হইতেই প্রচার-কার্য্যের জোর ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী হিন্দুয়ানির মহিমা প্রচার করিতে এই সময়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ', 'ভারতে ধর্ম্মপ্রচার', 'ভারতে উৎসব' প্রভৃতি তাঁহার প্রদত্ত অপূর্ব্ব বক্তৃতাবলী তখনকার দিনে অনেককেই বিমুগ্ধ করিয়াছিল। 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'য় বাঙ্গালার দুর্গোৎসবকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার যখন চেষ্টা চলিতেছিল, তখন তিনিই তাহার প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে বাঙ্গালার হিন্দুকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশের পাল-পার্ব্বণগুলি আধ্যাত্মিক ভাবের অনন্ত প্রস্রবণ। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—'তত্ত্ববোধিনী'র লেখক বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালীর হৃদয় খুলিয়া পাঠ করিতে শিখেন নাই। নহিলে বুঝিতে পারিতেন যে, এদেশে বহু মূর্ত্তিতে উপাসনা হয় বলিয়া বহু ঈশ্বরের উপাসনা হয় না।... রূপে, নামে, ভাবে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ভিতরে, বাহিরে,

অগ্রে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, নিম্নে, উর্দ্ধে, যথাতথা সর্ব্বথা তাঁহাকে দেখাই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা।"—এই সব বাক্যের প্রতিধ্বনি এই পুস্তকের অনেক প্রবন্ধ-মধ্যেই পাঠকেরা শুনিতে পাইবেন। জাতীয় প্রকৃতির সহিত জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহের সম্বন্ধ-সূত্র ধরিয়া হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার চেষ্টা কৃষ্ণানন্দই বোধ হয় এ সময়ে প্রথম করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহে নানা সহরে তখন 'আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা' সংস্থাপিত হয়।

কৃষ্ণানন্দের অভ্যুদয়ের অত্যল্প কাল পরেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ। বিলাতী শিক্ষা-সাধনা ও গবেষণার প্রভাবে যে শাস্ত্র-বাক্যের উপর আমাদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিতেছিল, সেই শাস্ত্র-বাক্যকে শিরোধার্য্য করিয়া তাহারই সহায়ে পণ্ডিত শশধর হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাবলীও অনেকের মনকে স্বধর্ম্মের প্রতি সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দল তাঁহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাকে প্রসন্ন-চক্ষে দেখেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দলবল-সহ 'প্রচারে' ও 'নবজীবনে' হিন্দুয়ানির আদর্শ-আলোচনায় নিযুক্ত হন, তখন স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন—"পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিঁকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।"

পক্ষান্তরে, বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি-স্থলের স্বরূপ বুঝাইতে গেলে তাঁহারই ভাষায় বলা যায়—"কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ, তাহার মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিতে মীমাংসা করিব,—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমাদের দেশী লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। 'সর্ব্বজ্ঞ' বা 'সিদ্ধ' মানি না; আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না। কেন না, যাহা অনৈসর্গিক তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা।" ইত্যাদি—এই মনোভাব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশের প্রতিমা-পূজা পর্য্যন্ত বহু বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে, বঙ্গসাহিত্যের শুধু শ্রীবৃদ্ধি নহে সেই সঙ্গে "যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা 'আমাদের' অবশ্য নিন্দনীয়,"—এ ধারণাও অনেক ইংরেজী-নবীশের মন হইতে কতক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল। তবে আপ্তবাক্যে যাঁহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেশী, তাঁহারা বঙ্কিমের এই বিচার-বিতর্কমূলক ধর্ম্মালোচনাকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের জগাখিচুড়ী' বলিয়া বিদ্রূপের হাসি

হাসিতেন। 'বৈদিক দেবতা-তত্ত্বে'র তাৎপর্য্য বুঝাইবার কালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রে যে-সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া তখন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় শুধু শশধর নহেন, ঐ 'প্রচার' পত্রেও একজন লেখক 'বেদ' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছিলেন—"আমরা হার্বার্ট স্পেন্সর, ডারউইন, কোমৎ, ম্যাক্সমুলর প্রভৃতির চিত্তের অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারি, কিন্তু ঋষি-চিত্ত-অবস্থা যে এইরূপ হইতে উন্নত অবস্থা, তাহা বুঝিতে পারি না। সেইজন্য ঋষিগণ বেদকে যে ভাবে দেখিতেন, আমরা বেদকে সে ভাবে দেখিতে ভুলিয়া গিয়া, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে ভাবে দেখেন, আমরাও বেদকে সেই ভাবে দেখিতে শিখিতেছি।--- পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে ঋষি-চিত্তের অবস্থা যে কত দূর উন্নত, তাহা আমরা এক্ষণে অনুভব করিতেও সক্ষম নহি ; ঋষিগণ যোগাবস্থায়, চিত্তে প্রতিবিম্বিত সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে জ্ঞান-লাভ করিতেন, সেই সকল সত্য-বিষয়ক তথ্য আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করিতেও অসমর্থ।"— এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই সব কথার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রকে কোথাও কিছু বলিতে শুনি নাই, এবং তাঁহার বেদ-বিষয়ক নিবন্ধগুলিও তিনি কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন নাই।

এইরূপ নানা মনীষীর নানা মত-সংঘর্ষের উত্তাপে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার-ক্ষেত্র যখন উত্তপ্ত—ব্রাহ্ম-সমাজ ক্রমে ভাঙ্গিয়া যখন তিনটি দলে বিভক্ত, সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আর্য্যধর্ম্মের যেন জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ এক অপূর্ব্ব পুরুষ বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন না, ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন না, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বড় বড় পণ্ডিত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বড় বড় ধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহার মুখে ধর্ম্ম-তত্ত্ব শুনিবার আশায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতেন। পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, আমি পরমহংসদেবের কথা বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রতিমা-পূজার সমর্থন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ইহাও বলিয়াছিলেন,—"আমি 'সাকারের উপাসনা' এবং 'সাকারোপাসনা' ভিন্ন 'সাকারবাদ' বা 'সাকারবাদী' শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, 'সাকারবাদ' অবশ্যপরিহার্য্য। ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।"—রামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত বাণী কিন্তু এরূপ নহে। তিনি সকলকে শুনাইতে লাগিলেন—"ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। ভক্ত জানে, আমি একটি জিনিষ, জগৎ একটি জিনিষ। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' (Personal God) হ'য়ে দেখা দেন।"—কতকটা এই কথাই অবশ্য অন্য সুরে সে সময়ে স্বামী কৃষ্ণানন্দের

বক্তৃতায় যে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই দিয়াছি। তবে যিনি ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য যুবকদিগের মধ্য হইতে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। শিবনাথের লিখিত 'দেবেন্দ্রনাথের জীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে আছে—"ভক্তশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট আমরা যখন যাইতাম, তখন একটি যুবক আমাদের সঙ্গে যাইত, তাঁর কথাবার্ত্তা তার যে কি ভাল লাগিল, তাহা বলা যায় না। তৎপর দেখি সে অবসর পাইলেই তাঁর নিকট যাইতে আরম্ভ করিল। পরে শুনিলাম, সে বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, সংসার-বিমুখ হইয়া ধর্ম্মসাধন ও রামকৃষ্ণ-প্রচারে আপনাকে অর্পণ করিল। যাহাকে জানিতাম হাল্‌কা, ছেপলা, উপহাস-রসিক, সে গভীর ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্মালোচনাতে নিমগ্ন হইল।"—সকলেই বোধ করি, বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই যুবকই পরে বিশ্ব-বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছিলেন। স্বামীজি নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন —"আমি প্রথমে ধর্ম্মের জন্য নানা সম্প্রদায়ে—বৈদেশিক ভাব-বহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে-ছিলাম, জানিতাম না যে, আমার জাতীয় ধর্ম্মে এত সৌন্দর্য্য আছে। আজকাল একদল আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—ইঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া একটি কথা রচনা করিয়া-ছেন। ইঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয়, কারণ উহা পৌত্তলিক। - - -আর একদল আছেন, তাঁহারা হাঁচি-টিক্‌টিকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। - - - ইঁহাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন, আমি তোমার অত-শত বুঝি না, বুঝিতে চাহি-ও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া, সব দুঃখকে ছাড়িয়া উহার অতীত প্রদেশে যাইতে—যাঁহারা বলেন, বিশ্বাস-সহকারে গঙ্গা-স্নানে মুক্তি হয়।—যাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত।"—যাঁহার কৃপা-প্রভাবে স্বামীজি এই 'প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত' ও 'জাতীয় ধর্ম্ম-সৌন্দর্য্যে' বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেও এই রচনার একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি পুতুল-পূজা হইতে সব পাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা বলিতেছি। হিন্দুগণ, যদি পুতুল-পূজা করিয়া এইরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংস-সকলের অভ্যুদয় হয়, তবে তোমরা কি চাও?—সংস্কারকগণের ধর্ম্ম চাও, না

—পুতুল-পূজা চাও?"—স্বামীজির এই প্রশ্ন পঞ্চাশ বৎসরের চেয়ে পুরাতন হইলেও এদেশের হিন্দুদিগের প্রতি এখনও ইহা প্রযোজ্য। কারণ, 'প্রাচীনের দলভুক্ত' হইবার আকাঙ্ক্ষা এখনও আমাদের মনে জাগে নাই। যখন নাম ও রূপের অন্তর্নিহিত গুপ্ত কথা কতকটা বুঝিতে পারিব, যখন উপলব্ধি হইবে, ভূদেব বাবু এই 'ভারতভূমিকে ভক্তির পীঠস্থান ও বঙ্গদেশকে ভক্তির মহাপীঠ' কেন বলিয়াছিলেন, তখনই 'প্রাচীনের চক্ষু' আমাদের ফিরিয়া আসিবে। তখনই জোর গলায় বলিতে পারিব—সংস্কারকগণের ধর্ম্মে আমাদের প্রয়োজন নাই,—পুতুল-পূজাই আমরা চাই।

বাস্তবিক, ভক্তি-শিক্ষা ও ভক্তি-সাধনের পক্ষে এমন অবলম্বন আর দ্বিতীয় নাই। তাই আমাদের পূজা-পার্ব্বণে—ব্রতানুষ্ঠানে উহা বড় বেশী রকম স্থান অধিকার করিয়া আছে। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলিতেন যে, আমাদের পূজা-পার্ব্বণগুলি শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির ফল নহে—অধ্যাত্ম-শক্তির উৎসও বটে। এগুলিকে বর্জন করিলে ফেরঙ্গ-ভাবের ভোগ-কালিমা আমাদিগকে চিরতরে ডুবাইয়া দিবে। আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য একেবারে বিলুপ্ত হইবে। এজন্য তিনি স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে তাঁহার 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় বাঙ্গালার পাল-পার্ব্বণ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে, 'নায়ক' নামক দৈনিক পত্রে পূজ্যপাদ পাঁচকড়ি বাবু কর্ত্তৃক এই ধারা অনুসৃত হয়। ১৩২৩ সালে, এই খবর কাগজে 'জীবনের সাড়া' নামে একটি প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন—"কর্ম্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, কেবল মেধার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া, বুদ্ধি-বৃত্তির কসরৎ বাড়াইয়া আমরা আমাদের চিনিতে ও জানিতে ভুলিয়াছি। জাতির অতীত ইতিহাসের আলোড়ন করিয়া, সমাজের রীতি-পদ্ধতির, পর্ব্বোৎসবের বিশ্লেষণ করিয়া, আমরা যে কি, আমরা যে কেমন, আমাদের জাতির বিশিষ্টতার ধারা অনন্ত অতীতকাল হইতে কোন্ প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কোনও খবর আমরা লইতে পারি না—লইতে জানি না। আত্ম-পরিচয় না হইলে কর্ত্তব্যের অবধারণ সম্ভবপর নহে। জাতির বিশিষ্টতার পরিচয় জানা না থাকিলে, কোন্ কর্ম্ম করিলে, তাহার ধারা বজায় থাকিতে পারে, কোন্ কর্ম্ম করিলে, তাহা কেবল হুজুগে পরিণত হয়, তাহা বুঝা যায় না। আমরা কেবল ইংরেজি লেখা-পড়াই শিখিয়াছি; পড়া-পাখী—আসামী ময়না—হরবোলা হইয়াছি। যে শিক্ষায় আত্ম-পরিচয় হইতে পারে, সে শিক্ষা আমরা পাই নাই।" এই আত্ম-বিস্মৃত জাতির যাহাতে আত্ম-পরিচয় ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে, পাঁচকড়ি বাবু এই দেশের পাল-পার্ব্বণ-উপলক্ষ্যে কত লেখা যে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হিসাব করিয়া

বলা সুকঠিন। সুলভ মূল্যের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সে সব অমূল্য রচনা এখন আর পাইবার কোনও আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু সেগুলিও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতেছিল। সেই সব বিনষ্ট-প্রায় প্রবন্ধ হইতে বাছিয়া লইয়া কয়েকটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সর্ব্বশুদ্ধ ছাব্বিশটি প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে। তন্মধ্যে একুশটি রচনা সংবাদপত্র হইতে এবং অবশিষ্ট পাঁচটি মাসিকপত্র হইতে সংগৃহীত। উপাধ্যায় মহাশয়ের কতকগুলি লেখা একত্র করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে 'পাল-পার্ব্বণ' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার 'বৈশাখী পূর্ণিমা,' 'নবান্ন,' 'আকাশ-প্রদীপ' প্রভৃতি রচনা ছিল না। এ পুস্তকের শুধু 'জামাই-ষষ্ঠী' ছাড়া আর সকল প্রবন্ধেই লেখকগণের নাম আছে। আমি উহা 'প্রবাহিণী' পত্রিকার জন্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু পাঁচকড়ি বাবুর দ্বারা উক্ত রচনা কতকটা রূপান্তরিত হওয়ায় উহাতে কাহারও নাম দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না।

বর্ত্তমানে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেরূপ বিপন্ন, তাহাতে এইরূপ পুস্তক-প্রকাশের সার্থকতা বা উপযোগিতা কি, সে-কথা এই পুস্তকের 'ভূমিকা'য় পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বুঝাইয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ।

জগদ্ধাত্রী-পূজা, ১৩৫৬

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ

বৈশাখী পূর্ণিমা

১

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

এই পূর্ণিমা কোথায়? নভোমণ্ডলে না ভারত-মণ্ডলে? আকাশের চাঁদ দেখিয়াছ, দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছ, কিন্তু এমন চাঁদ দেখিয়াছ কি? যাহার আলোকে শুধু একটা পক্ষ নহে—যুগ-যুগান্ত আলোকিত হইয়া আছে! মানব-জাতির ব্যথার আঁধার ঘুচিয়া গিয়া আনন্দের পৌর্ণমাসীর উদয় হইয়াছে!

এই বৈশাখী পূর্ণিমায় অমিতাভ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। অমন অমিত-আভা পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় কি? পূর্ণিমার কৌমুদী-বিস্তার আজ মাত্র তোমায় আলোক দিল—কাল আবার পূর্ণতার অপহ্নব ঘটাইয়া অমার আঁধারে ডুবাইয়া দিবে। আর অমিতাভ বুদ্ধদেব তোমার জন্ম-জন্মান্তরের আলোক, তোমার ইহ-পরকালের দীপ্তি, তোমার ভ্রান্তির—ক্লান্তির—অমা-রজনীর চিরন্তন অপনোদন করিবে।

আজ তথাগতের জন্ম-মুহূর্ত্তে একটা কথা ভাল করিয়া বোঝা চাই যে, ভারতবর্ষ ভোগ-ভূমি নহে—ত্যাগের পীঠস্থান। এখানকার দীপ্তি, ভোগের জৌলসে নহে—ত্যাগের প্রভায়। ভারতের মহিমা ত্যাগে—দিগ্বিজয়ে নহে। যেদিন এই ত্যাগের পথ হইতে ভারতবর্ষ বিচ্যুত হইবে, সেদিন ভারতের আলোক-দীপ্তি নিভিয়া যাইবে—অমার অন্ধকারে ভারতাকাশ কলঙ্কিত হইয়া যাইবে।

আশঙ্কা হইতেছে—সেই দিন বুঝি বা আসে—ফেরঙ্গ-ভাবের ভোগ-কালিমা ভারতকে বুঝি চিরতরে ডুবাইয়া দেয়।

সাবধান ভারতবাসী! আজ আকাশের দিকে তাকাও, ঐ পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তির মাঝে দেখ, শ্রীভগবান্ গৌতম বুদ্ধের মৈত্রী-দীপ্ত আঁখিযুগল জ্বল জ্বল করিতেছে! ভারতের পথ হইতে বিচ্যুত হইও না; শ্রদ্ধালু চিত্তে তথাগতের শরণাগত হইয়া বল—"তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

—সন্ধ্যা

২

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

'আজ বৈশাখী পূর্ণিমা,—আজ ফুলদোল,—আজ ওলাই চণ্ডীর পূজা'—এ সকল উক্তির মহিমা ও প্রভাব পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। সে ফুলদোলের মাধুরী এখনকার যুবজনের কল্পনাতীত। তাই বৈশাখের নির্ম্মেঘ নীল আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের রজত থালার বিকাশ দেখিয়া

'মনে পড়িল রে আমার সেই ব্রজভূমি'

আমার সেই উল্লাস-উৎসবময়ী, পুষ্পাভরণ-ভূষিতা বঙ্গভূমিকে—সেকালের বাঙ্গালা দেশকে ও জাতিকে মনে পড়িল। এখন ছেলেদের গলা ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—জান না, বাঙ্গালা যে এককালে ফুলের দেশ ছিল। এমন বার মাস পুষ্পাভরণে ভূষিত ভূমি উত্তর ভারতে কুত্রাপি ছিল না। এই ফুলদোলের বাহার কলিকাতা হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাহা ফুটিত, তাহার শত-অংশের এক-অংশও আজ নাই। রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের হারিংটন ষ্ট্রীটের ভবনে আমাদিগকে একবার ফুলদোলের উৎসবে হাজির থাকিতে হইয়াছিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ভৃত্য আসিয়া বলিল—'সূতার কাপড় পরিয়া ভিতরে যাইতে পারিবেন না, আমি কাপড় চাদর দিতেছি।'—এই বলিয়া সে যূথিকার টানা-প'ড়েনে তৈয়ারী একখানা ফুলের কাপড় দিল এবং বেলার চাদর দিল। কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, সকলেরই এক সাজ—ফুলের ধুতি, ফুলের চাদর, ফুলের উষ্ণীষ, ফুলের আভরণ-অলঙ্কার, আর দুই ইঞ্চি মোটা নানা রঙের ফুলের কার্পেট বিছাইয়া তাহারই উপর কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তনের মহাজনপদ গান করিতেছে। এ ব্যবস্থা কেবল ইন্দ্রচন্দ্রেরই ছিল না, যাহার গৃহে নারায়ণ-শিলা থাকিত, নিত্য-সেবা হইত, তাহারই গৃহে ফুলদোল হইত। সেকালে প্রায় সকল গৃহস্থই শালগ্রাম-সেবা করিতেন; সুতরাং ফুলদোলের উৎসব ঘরে ঘরে চলিত। তেমন যুঁই ও বেলার গোড়ে এখন আর দেখিতে পাই না।—'চাই বেল ফুল'—এ ডাক কলিকাতায় যেন বন্ধ হইয়াছে। এখন তেমন ফুলের প্রাচুর্য্য নাই, কুসুম-শোভায় শোভিত থাকিবার প্রবৃত্তিও যেন বাঙ্গালী হারাইয়াছে।

ফুলদোলের বাহার ও ধূম ছিল—খড়দহে, শান্তিপুরে, নবদ্বীপে, গুপ্তিপাড়ায় ও কাটোয়ায়। খড়দহে শ্যামসুন্দরের ফুলদোল একটা দর্শনীয় ও উপভোগ্য ব্যাপার ছিল। বাঙ্গালার প্রতি গৃহ এই সময়ে পুষ্পপূর্ণ থাকিত। এখনকার

কয়টি ছেলে মালতী এবং মাধবীর ব্রততী-বিতান দেখিয়াছে ? একটা মালতীর ঝাড়ে ও লতায় এক-একটা কুঞ্জ তৈয়ার হইত, একটা মাধবীতে একটা বড় মাধবীকুঞ্জ তৈয়ার হইত। এখন মালতী ও মাধবী ফুলই অনেকে চিনিতে পারে না। অথচ আমাদের বেশ মনে আছে, কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর দুই ধারের প্রায় প্রতি গ্রামেই মালতী এবং মাধবীকুঞ্জ ছিল। সে পলাশের শোভায় আর প্রতি পল্লীতে অনুরাগ-রক্তিম-বিভা ফুটিয়া থাকে না, আর সে কাঞ্চন ফুল দেখিতে পাই না, নানাবিধ চম্পক বাজারে আসে না। ফুলময়ী বঙ্গভূমি অধুনা কুসুমশূন্যা। অতএব ফুলদোলের সে বাহার নাই, সে উল্লাস-মদিরা-প্রমত্ত নর-নারীর হাস্য-কোলাহল নাই।

—নায়ক

সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আজ সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী। কত যুগ-যুগান্তর হইল এই জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর অন্ধকারে, বিন্দু বিন্দু বারিপাতে, তড়িতের পৌনঃপুনিক ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যে, ঘন বিজন কাননে, বজ্র-ঘোষমধ্যে, সাবিত্রী সতী—সত্যবান্‌কে ক্রোড়ে করিয়া একাকিনী উপবিষ্টা ছিলেন। সংসারে কিছুরই লোপ হয় না। এখনও সেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর অন্ধকার পৃথিবীকে নিরয়-তুল্য করিয়া ফেলে, তড়িতের তীক্ষ্ণ কটাক্ষক্ষেপ এখনও পাপীর পক্ষে শাণিত খড়্গারূপে ক্ষণে ক্ষণে ভয় প্রদর্শন করে, এখনও গহন বনে সিংহ শার্দ্দুল মনুষ্যের হৃৎকম্প-উৎপাদনার্থ হুঙ্কার করিয়া থাকে, এখনও বারিদমণ্ডলী সুগভীর গরজনে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া মহেশের মহাযশোঘোষণা করিয়া থাকে, এখনও সাবিত্রী সতী স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া একাকিনী উষ্ণ অশ্রুপাত করিয়া থাকেন।

সংসারের কিছু লোপ হয় না ? কে বলিল ? সকলই লোপ হইতে পারে। কেবল নিসর্গ থাকে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম থাকে। ভারতের সব লোপ হইয়াছে, আছে কেবল ভারতের নিসর্গ। হিমালয়, বিন্ধ্যাচল আছে ; গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী আছে। আর

বজ্র, বিদ্যুৎ, বারি, বৃষ্টি আছে। সে প্রাচীন আর্য্য-স্বভাবের কিছুমাত্র নাই। আছে কেবল এক সাবিত্রী। ভারতে সতীত্ব এখনও আছে।

সে রাম নাই, যে 'রাম রাজ্য' করিবে। সে অর্জুন নাই, যে দেবাদিদেবকে পরাস্ত করিবে। সে কর্ণ নাই, যে অতিথি-সৎকার-জন্য একমাত্র অপত্য বিসর্জন করিবে। সে মুনি-ঋষিরা আর নাই, যে বেদোপনিষৎ লোককে শুনাইবে। সে ব্যাস-বাল্মীকি নাই, যে রামায়ণ-মহাভারত-রচনে লোককে মোহিত করিবে। সে সকল লোকের কিছুই নাই। সে শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিবেক, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব তাহার কিছুই নাই। আছে কেবল সাবিত্রী, সতীত্ব, পতি-ভক্তি। সে দিন বন্ধুবিশেষ বিসূচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তদীয় পত্নীকে তাঁহার সেবা করিতে দেখিলাম। আমি সেই সাবিত্রীই দেখিলাম। সেই প্রাচীন কালের পতি-ভক্তি সন্দর্শন করিলাম। এই পতি-ভক্তি স্বর্গীয়া। নরের পক্ষে সতী নারী, দেবতা। অথচ এমন লোকও আছে, তাহারা এই অপূর্ব্ব পতি-ভক্তির হ্রাসকারী কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। তাহারা কি অদূরদর্শী! আর যদি জ্ঞানকৃত পাপী হয়, তবে কি নরাধম!

মুসলমানেরা হাসেন-হোসেনের সমরে পতন শোক-সহকারে বর্ষে বর্ষে স্মরণ করে, খ্রীষ্টানেরা যীশু খ্রীষ্টের জীবন-দান স্মরণ করে। জৈনেরা তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মোক্ষ-প্রাপ্তি-স্মরণার্থ উৎসব করে। ইংলণ্ডীয়েরা বিশ্বাসঘাতক গাইফক্সকে বর্ষে বর্ষে শাস্তি প্রদান করে। আমরা এ সকলই করি। রাবণ-বধ-স্মরণার্থে বিজয়াতে পরস্পরে আলিঙ্গন করি। জন্মাষ্টমী, শ্রীরাম-নবমীতে উপবাস করি, দোল-যাত্রার পূর্ব্ব দিন দেশীয় গাইফক্সরূপী মেড়াসুরকে দগ্ধ করি; এ সকলেই করি। অধিকন্ত সাবিত্রী-চতুর্দ্দশীতে ব্রত করিয়া থাকি। সতী-অঙ্গ স্বয়ং যমরাজও স্পর্শ করিতে পারেন না। আমরা একথা বিশ্বাস করি, যে সতী, সে কখনও বিধবা হয় না। স্বামী ইহলোকেই থাকুন, আর পরলোকেই থাকুন, সতী সেই স্বামীর ব্যতীত আর কাহারই নহে। তবে সতী কিরূপে বিধবা হইবে? সাবিত্রী-চতুর্দ্দশীর ব্রত-কথায় আমরা এই কথা শিক্ষা প্রদান করি। যে নারী এই মহৎ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহাকে কখনই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চমৎকার উপদেশ! চমৎকার ধর্ম্ম!

—সাধারণী, ১২৮১

জামাই-ষষ্ঠী

এই জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই-ষষ্ঠী। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে যত ব্রত-পূজা আছে, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—আত্ম-জন্য; দ্বিতীয়—সমাজ-জন্য; তৃতীয়—সম্বন্ধ-জন্য। আত্মরক্ষা ও আত্মার উন্নতির জন্য যে সকল ব্রত-পূজা, তাহা আত্ম-জন্য; যেমন কালীপূজা, শিব-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি। সমাজ-রক্ষা ও সমাজের পুষ্টির জন্য যে সকল ব্রত-নিয়ম, তাহাকে সমাজ-জন্য বলে; যেমন দোল-দুর্গোৎসব, নন্দোৎসব প্রভৃতি। সংসারের বা পরিবারের সম্বন্ধ যাহাদের সহিত আছে, তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া যে সকল ব্রত-পূজা করিতে হয়, তাহাদের সম্বন্ধ-জন্য বলে; যেমন ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী, জামাই-ষষ্ঠী, বীরাষ্টমী প্রভৃতি। এই তিন শ্রেণীর ব্রত-পূজায় সাক্ষাতে বা পরোক্ষে আত্মার উন্নতি-চেষ্টা আছেই, তবে বিনিয়োগ কখনও বা জগদ্ধিতায়, কখনও শ্রীকৃষ্ণায়, কখনও বা ব্যক্তিবিশেষের নাম করিয়া বলিতে হয়। জামাই-ষষ্ঠী খাঁটি সম্বন্ধ-জন্য ব্রত বা উৎসব। ষষ্ঠী-পূজা পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া করিতে হয়; জামাতাও পুত্রবৎ, তাই জামাতার কল্যাণ-জন্য একটা ষষ্ঠীর ব্রত স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। এই দিনে প্রত্যেক বিবাহিতা কন্যার জননী নিজ নিজ কন্যার পতিকে পুত্রের আসনে বসাইয়া, পুত্রোচিত আদর ও পূজা করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। প্রথমে ষষ্ঠীর পূজা, তাহার পর মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও কথা; শেষে ফলপূর্ণ অর্ঘ্যপাত্র দিয়া জামাতার আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ এই যে, জামাতা পুত্রতুল্য হউক—পুত্রের স্থানীয় হউক এবং স্বয়ং বহু পুত্র-কন্যার জনক হইয়া আমার মাতৃত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখুক। পুত্র যেমন পিতার আত্মজ, কন্যা তেমনি জননীর আত্মজা। পুত্রের সাহায্যে পিতার পিতৃত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে; কন্যার সাহায্যে মাতার স্ত্রীত্বের বা জননীত্বের ধারা অব্যাহত থাকে। কেননা, স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্ব এই দুয়ের সমবায়ে মনুষ্যত্ব; সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার জন্য জামাই-ষষ্ঠী-ব্রত।

যতদিন কন্যা জামাতা দৌহিত্র জীবিত থাকিবেন, অথবা যতদিন দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং জামাতা জীবিত থাকিবেন, ততদিন বর্ষে বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীর দিন জামাতার পূজা করিতেই হয়। বিশেষতঃ জামাতা পুত্রপৌত্রাদি পরিবৃত হইলে তেমন জামাতার পূজা সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার তাড়সে জামাই-ষষ্ঠীটা নূতন জামাতা লইয়া জমাইয়া তোলা হয়। পুরাতন জামাতা যাহার পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছে, তাহার আদর ও পূজা হয় না। অথচ শাস্ত্রের আদেশ মান্য করিতে হইলে, যে জামাতার

পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছে, কন্যা-সহ তাহারই পূজা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কেননা, সে যে বহুপোষী হইয়া কল্যাণ-কামনার পূর্ণতা সাধন করিয়াছে। তাহার দ্বারা মাতামহকুলের ধারা সুরক্ষিত হইয়াছে। জননী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মাতৃত্বের ধারা সে অব্যাহত রাখিয়াছে। জামাই-ষষ্ঠি বাবুয়ানীর উৎসব নহে—ইয়ারকীর উৎসব নহে—বংশানুক্রমের বা Heredityর উৎসব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাল-বশে এমন উৎসবটা বিলাসের উৎসবে পরিণত হইয়াছে। নূতন জামাতা দুই বৎসর কাল শ্বশুর-বাড়ীর আদর-যত্ন পাইয়া থাকেন ; তাহার পর চিরজীবনটা জামাতার সহিত শ্বশুর-গৃহের তেমন স্নেহ-সম্পর্ক থাকে না ;—শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কোন সম্বন্ধ রাখেন না, জামাতা ত রাখেনই না। কন্যাদান করিলেই শ্বশুর-শ্বাশুড়ী মনে করেন—দায় দিয়া ঘর ছাড়িল ; জামাতা মনে করেন, যা পারিলাম জন্মের মতন আদায় করিলাম। যাহাতে উভয় পক্ষে সদ্ভাব থাকে—আত্মীয়তা বজায় থাকে—দুইটি সংসার এক হয়, সে চেষ্টা কাহারও নাই। তাই মনে হয় যে, এখনকার দিনে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া সংসার-সুখে কেহ সুখী হইতে পারে না ; বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে পারিবারিক আনন্দ-উল্লাস আর নাই ; সব দোকানদারী, সব লেন-দেনের কাণ্ড হইয়াছে। কন্যা-বিবাহের পণ কমাইবে কেমন করিয়া ?

ভাব লইয়া সংসার। এই ভাবকে মধুময় করিতে পারিলে সংসার-যাত্রাটাও মধুময় হইয়া উঠে। আমাদের শাস্ত্র মধুময় ভাব দিয়া জীবন-যাত্রাকে মধুময় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের সে মাধুরী বর্জ্জন করিয়াছ, জীবনটাও তাই কঠোর হইয়াছে, সদা হাহাকারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ; তোমরা কিছুতেই সুখী ও তুষ্ট হইতে পারিতেছ না।

—প্রবাহিণী, ১৩২১

স্নান-যাত্রা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

যাত্রা বলিলে সচরাচর গমন বুঝায়। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অর্থ—উৎসব। তাই আমরা বলি—রথ-যাত্রা, দোল-যাত্রা, স্নান-যাত্রা।

আজ স্নান-যাত্রা। কাহার স্নান? আনন্দময় আত্মকাম নির্গুণ পুরুষের আবার স্নান কিরূপে সম্ভবে? মানুষের এত বড় স্পর্দ্ধা যে যিনি ভূমা, যিনি

অনন্ত, তাঁহাকে কি না স্নান করাইয়া তুষ্ট করিতে চায়। মানুষ অতি ক্ষুদ্র—তাহার কোন দোষ নাই। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে মহৎকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আছে। সে আকাঙ্ক্ষা, স্পর্দ্ধা নহে—উহা দৈবী। মাধামর শ্রীহরি এতই প্রেমের বশ যে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নিজেই ছোট হন। যে ছোট—যে দীন-দুঃখী—তাহার খাতিরে যদি মহান্ ছোট হন—তবেই মহত্ত্বের মহত্ত্ব। প্রেমে ও বিনয়ে যত মহিমা—ঐশ্বর্য্যে তত নহে। যখন ভগবান্ স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্র ভাব ধারণ করেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র প্রতিমা লইয়া ক্ষুদ্র ভক্তেরা যদি পূজা করে, তাহা হইলে কোন দোষই স্পর্শে না, বরং ভগবানের প্রীতিই সাধিত হয়।

ভগবান্ প্রেমে ছোট হইয়া ধরা দেন, কিন্তু তুমি যদি তাঁহাকে ছোট কর—তাঁহার অবমাননা হইবে। তুমি ধ্যানে তাঁহাকে ধরিতে পার না, তাই তিনি মাধুর্য্য-বিগ্রহ ধারণ করিয়া তোমার নিকট হইতে অভিষেক-লেপনাদি সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে তিনি স্নানশীল চন্দনপ্রার্থী—তোমার ঘোর অপরাধ হইবে। যিনি কোটি বিশ্বকে প্লাবিত করেন—যিনি অনন্ত আনন্দের আধার—তিনি কি স্নান বা চন্দন-সুখের আকাঙ্ক্ষী? তুমি যাহাতে ক্ষুদ্রতার ভিতর দিয়া মহৎকে দেখিতে পার, তাহারই জন্য তিনি ছোট হইয়া আসেন। আর তুমি যদি সেই প্রেমের বিকাশে কেবল ক্ষুদ্রতাই দেখ, তাহা হইলে তুমি যে নীচ সেই নীচই থাকিবে—তোমার আর গতি হইবে না। সাবধান—আজ স্নান-যাত্রার দিনে ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া দাও।

তুমি মনে করিতেছ, ভারি ঘটা করিয়া বিগ্রহ-স্নান করাইতেছি। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ—যিনি বিশ্বরূপ, তিনি কিরূপে স্নান করিতেছেন। আকাশ ঘন-নীরদ-নীল—দিঙ্মণ্ডল শ্যামায়মান—চতুর্দ্দিকে ঘোর ঘটা। কখনও বা বজ্রের ভৈরব রোল, কখনও বা বিজলীর হাসি। তোমার চন্দ্রাতপ, ঢাক-ঢোল, আলোকমালা—এই গম্ভীর শোভার কাছে কি তুচ্ছ! আর দেখ, কি বিরাট স্নান! দর দর করিয়া মুষলধারে বর্ষা নামিল। আতপ-তাপিত বসুন্ধরা স্নিগ্ধ হইল—বিশ্ব-প্রাণ জুড়াইল। ঐ দেখ শ্যামসুন্দর বল্লরীবেষ্টন তরুবর স্নান করিয়া কুন্তলোলে বিধুনিত হইতেছে। তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে স্বয়ং সৎ-স্বরূপ মায়াময়ী শ্যামা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া স্নান-বিলাস করিতেছেন? আরও উপরে উঠ। ঐ যে নীরদ-নীলিমা—উহাও তোমার জীবিতেশের রূপ। আর ঐ যে বর্ষা, উহাও সেই প্রেমিকের ছল। সবই একাকার। অরূপ আজ শ্যাম-রূপ ধরিয়াছেন—শ্যামঘন—শ্যামময়—শ্যামপ্রকৃতি।

আজ স্নান-যাত্রার দিনে ভেদ ভুলিয়া যাও। অসীম অম্বর হইতে ঝরঝর ধারা পড়িতেছে—বিপুল ভূমণ্ডল অভিষিক্ত হইতেছে। ভাল করিয়া বুঝিলে জানিতে পারিবে যে, ইহা বিশ্বরূপের স্নান-যাত্রা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি এত বড় বিরাট স্নান—যদি ভেদাভেদ নাই—তবে আর একটি ছোট বিগ্রহকে স্নান করান কেন! আমরা নাকি বড় ছোট, তাই ছোট নহিলে প্রাণটা পূর্ণ হয় না—আর প্রাণটা না ভরিয়া উঠিলে অনন্তের পূর্ণতা ধরিতে পারি না—শূন্যতায় পড়িয়া মরিয়া যাই। কিন্তু ঐ ছোট বিগ্রহ-স্নানে যদি তুমি বিশ্বরূপের আনন্দ-বিলাস না দেখিতে পাও—তুমি প্রবৃত্তির দাস হইয়া চিরকালই কর্ম্মের ভেদচক্রে ঘুরপাক খাইবে। যে মুহূর্ত্তে ছোটর ভিতরে বড় দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার মুক্তির পথ খুলিবে।

হায় বঙ্গদেশ—তোমার স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়াছে। তুমি আজ অভেদ-মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া ভেদবাদের খুঁটিনাটিতে মজিয়া গিয়াছ। আজ স্নান-যাত্রার দিনে দেবাদিদেব জগন্নাথের অভেদ-লীলা-বিলাস দেখিয়া তোমার প্রাণ যেন প্রেমে মাতিয়া উঠে।

—সন্ধ্যা

রথ-যাত্রা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ইংরেজি পড়িয়া কি বিপদ্ই হইয়াছে! সমস্ত রস-কষ শুকাইয়া গিয়াছে। এখন আর রথ-দোল ভাল লাগে না। ফুটবল, ব্যাটবল, থিয়েটার—এই সব ভাল লাগে, আর পাল-পর্ব্ব-মেলা সব অশিক্ষিত ছোট লোকের কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

কাল রথ-যাত্রা। ছেলেমেয়েরা আনন্দে মাতিবে ও ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে সংসার-রথের সারথি জগন্নাথদেবের জয়ধ্বনি করিবে। কাল রথতলার আনন্দবাজারে কি ঘটা, কি বাহার—কি সুখ-সমাগম! গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে অসংখ্য পুরুষ ও নারী আসিয়া মায়াধীশকে দর্শন করিবে ও সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য কত কি জিনিষপত্র কিনিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সভ্য-সম্প্রদায়ের এ-সব কিছুতেই মন ভিজে না। তাঁহারা

কেবল বলেন—কে ওখানে লোকের ভিড় ঠেলে ধুলা-কাদা খেয়ে রথ দেখিতে যাইবে! আর মেলার যে শ্রী—কতকগুলা তেলে-ভাজা পাঁপড়-কচুরি ও পেতে, চুপড়ি, মাদুর, খোরা পাথরবাটি বিক্রি হয়! কোনও ভদ্রলোক কি ওখানে যেতে পারে? এই সভ্য বাবুদের ইংরেজি পড়িয়া স্বদেশের ও স্বজাতির সহিত সব মর্ম্ম-বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে।

তাঁহারা এখন ইংরেজি-ভাবে উৎসব মেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বক্তৃতা ও করতল-চট্‌চটা ধ্বনির চোটে আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিদেশী বিদ্যা পড়িয়া স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়াছে। ঐ বিভ্রম-সংশোধনের জন্যই দুই-একটা কথা বলার প্রয়োজন।

আমাদের শরীর একটি জীবন্ত রথ। সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই রথেররথী। কর্ম্মচক্রে ইহা তাড়িত, ঘূর্ণিত, চালিত হইতেছে। হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যেরূপ নিয়োগ করিতেছেন, সেইরূপই ইহা চলিতেছে। আবার একটি একটি করিয়া সকল শরীর গ্রহণ করিলে সমগ্র মানব-সমাজ এক প্রকাণ্ড রথের ন্যায় প্রতীত হইবে। আরও যদি আয়তন বৃদ্ধি করিয়া জড়-চেতন যক্ষ-রক্ষঃ কিন্নর-গন্ধর্ব্ব দেবগণকে লওয়া যায়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ-ভুবনব্যাপী এক অনির্ব্বচনীয় সুবিশাল রথ বুদ্ধিগোচর হইবে। শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব জগন্নাথ এই বিশ্বরথের রথী। ঐ যে ভৈরব বজ্র-নির্ঘোষ শুনিতে পাইতেছ—ঐ যে মলয়ানিলের মৃদুমন্দ ঝুর ঝুর শব্দ—ঐ যে মধুমাখা প্রেমালাপ—উহা সমস্তই ঐ রথচক্রের গতি নির্দ্দেশ করিতেছে। ঐ যে করুণাময়ী জননী সুকুমার শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন—ঐ যে দস্যু সেই শিশুকেই কাঞ্চন-লোভে হত্যা করিতেছে—ঐ যে রণ-ডাকিনীরা নর-শোণিত পান করিতেছে ও হুহুঙ্কার রবে তাণ্ডব-নাচ নাচিতেছে—ঐ যে দাতা লক্ষ লক্ষ অনাথকে অন্ন-দান করিতেছে—এই সব ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, শুভ-অশুভ, জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ—সেই বিশ্বরথীর নিয়োগেই হইতেছে। তাঁহার হাতে রাশ—সাধ্য কি যে রথ বা কর্ম্ম-চক্র তাঁহার রাশের টান না মানে। কোথাও কোন সময়ে এক চুল এদিক ওদিক হইবার জো নাই! ঠিক রাশমাফিক চলিতেই হইবে।

তবে কি ভাল-মন্দ নাই? কেন—যাহা ভাল, তাহা ভাল; যাহা মন্দ, তাহা মন্দ। মানুষ যাই মনে করে যে সে কর্ত্তা—অমনি সে দ্বন্দ্বের মধ্যে গিয়া পড়ে। দ্বন্দ্ব কি,—ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ। যে নিজেকে কর্ত্তা মনে করে, সে কর্ম্ম উপার্জ্জন করিবেই করিবে। আর কর্ম্ম উপার্জ্জন করিলে ফলভোগ করিতেই হইবে। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এই ভোগ হয়। কর্ত্তৃত্ববোধ থাকিতে এই দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া যায় না। কিন্তু মানুষ যদি একবার মায়াধীশকে দেখিতে

পায় ও বুঝিতে পারে যে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা—তাহার কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই—সে মুক্তির পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। রথের রথী মায়াধীশকে দেখিলে আর সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে হা-হতোঽস্মি করিতে হয় না। সকলকেই কর্ম্ম-চক্রে পিষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু যে জানে যে ঐ চাকা জগন্নাথের চাকা—সে 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া ঐ দ্বন্দ্ব-বিরোধ আনন্দের সহিত সহ্য করে। আর যে রথের রথী মায়াধীশকে জানে না—নিজেকেই কেবল কর্ত্তা মনে করে—সে চাকার তলায় পড়িয়া 'গেলুম মলুম' বলিয়া আর্ত্তনাদ করে। এই সুগভীর তত্ত্ব-কথা বুঝাইবার জন্যই রথ-যাত্রা।

এস আজ রথ দেখিতে যাই। আমাদের ছোট মন, ছোট বুদ্ধি। এস, ঐ ছোট রথে বিশ্বরথ আরোপ করি, আর ঐ ছোট জগন্নাথটিকে দেখিয়া বিশ্বনাথের ধ্যান করি। ছোট রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া একবার সংসার-রথ ও কর্ম্ম-চক্রের কথা ভাবি। এই রথ দেখিয়া যেন বুঝিতে পারি যে যিনি বিশ্ব-নিয়ন্তা, তিনি এই বিশ্ব-রথের চালক। প্রেমের চোখে রথ দেখ ও জগন্নাথ-দেবের দর্শন কর, আর বল—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

—সন্ধ্যা

জন্মাষ্টমী

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কৃষ্ণাষ্টমীর সন্ধ্যা। কংস কারাধ্যক্ষকে বলিল,—"সাবধান! দেবকীর আজ সন্তান হইবে।" দেবকী কংসের ভগিনী। কংস—রাজা। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র—তাহার যম। এই নিমিত্ত দেবকী কারাগারে। পত্নী-অনুরাগী স্বামীর সেই দশা ভিন্ন আর অন্য দশা নাই। কংস বলিল—"সাবধান।" কারাধ্যক্ষ প্রণাম করিয়া গেল। অজস্র জল-ধারা। এমন ধারা কেহ কখনও দেখে নাই। বিদ্যুৎ খেলিতেছে—খেলিতেছে, পুনঃ পুনঃ খেলিতেছে; বজ্রনাদে মুহুর্মুহুঃ খেলিতেছে—ঘোরতর জল-ধারা! কারাধ্যক্ষ—কংস-অনুচর

নিজালয়ে গমন করিল। ঘোর রজনী! সতর্ক রজনী! জীব-কুল-ভয়ঙ্কর রজনী! রজনী প্রলয়রূপিণী! রজনীর তুলনা নাই। এ রজনীতে কে কোথায় যায়! বিকট রজনী—এ রজনীতে স্থান চাই—কারাগারেও স্থান চাই! দেবকী, কংসের ভগিনী, জিজ্ঞাসিলেন—"বসুদেব, পুত্র হইলেই ত কংস-অনুচর-বধ করিবে? বাছা, তুমি অন্য কোন স্থানে—শ্মশান-ভূমে জীবিত হও। থাক, আমার গর্ভেই থাক।"

ধারা ঝরিতেছে,—বিদ্যুৎ খেলিতেছে,—বজ্রোৎপাতে মেদিনী-বক্ষ বিদারিত হইতেছে। প্রকৃতি বলবতী! দেবকী প্রসব-বেদনা সংবরণ করিতে পারিলেন না। সন্তান, পুত্র-সন্তান, দেবকী চাহিতে ভরসা করিতেছেন না। "আহা! মা বলিতে জানে না, মা-চাওয়া মুখ। হস্ত নাড়িতেছে, আমায় খুঁজিতেছে। এখনই কংস-চর প্রস্তরে প্রক্ষেপিত করিয়া প্রাণ-নাশ করিবে!" বসুদেব বলিলেন,—"সন্তান সকলে বলে ভাল; সকলে বলে, সন্তান-দ্বারা কারামুক্ত হইব; এই সন্তান, সেই সন্তান! সন্তানকে লুকাইতে পারিব কি?" সন্তান প্রসন্ন-মূর্ত্তি! সন্তান কৃষ্ণবর্ণ! সন্তান অদ্ভুত ভাবোৎপন্নকারী! সন্তান কিছুই বলে না, মার কোল-পানে ধায়, মার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করে। সন্তান নির্ব্বল! কিন্তু নির্ব্বলে অতি বলবান্। সন্তানের মুখ দেখিয়া পিতা প্রাণ-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত, সন্তানের কল্যাণ চায়। মাতা সন্তানকে দেখিতে চায় না, জীবন কামনা করে। এই আমার সন্তান, সন্তান জীবিত থাকুক—মাতার কামনা। এইরূপ রজনী আর হয় নাই, হইবার সম্ভাবনা নাই। রজনী কাল-রাত্রি-স্বরূপা। কিন্তু কাল-রাত্রি হইতে মাতৃস্নেহ বলবান্। প্রস্ফুটিত পিতৃস্নেহ সেইরূপ বলবান্। পিতা ভাবিলেন—"সন্তানের একমাত্র রক্ষার উপায়—স্থান-ত্যাগ।" বসুদেব, কৃষ্ণবর্ণ প্রফুল্ল-নয়ন পুত্রকে কোলে করিলেন। "যাব, পুত্রকে লইয়া যাব, কোথায় যাব? কারাগার! আমার ত বাহিরে যাইবার অধিকার নাই।" এ কি! কারাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন! ক্বচিৎ কোন সতর্ক প্রহরী স্বপ্ন দেখিল, কে যায়? জাগিল না। ঘোর দুর্য্যোগ! কে কোথায় যাইবে? কে আত্মঘাতী আছে? এই, সেই, হেথা, সেথা—বজ্রাঘাতে কে প্রাণ পাইবে? অতি স্বার্থে, প্রাণ-প্রেয়সীর অনুরোধে, বসুদেব কারাগারে প্রসূত পুত্র লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। অষ্টম গর্ভের পুত্র, সকলেই বলে, এ পুত্রোৎপাদন ভাগ্য অপেক্ষা করে। কথা ন্যায্য বা অন্যায্য হ'ক, কারাবাসী কেবল ভাবিলেন,—"পুত্র থাকিলেই হয়, আমি মরিলেই আমি থাকিবার সম্ভাবনা, আমারই পুত্র।" দেবকী, তাঁহার ভাব বর্ণনা করিতে জানি না। পত্নী, পতির নিমিত্তই কারাবাসিনী। কারাগার—

তথাপি আশ্রয়স্থল। সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পতি চলিলেন। "হায়! বাছা স্তন-পান করিতেছিল, ক্ষুধা পাইয়াছে, বাছা কোথায় স্তন-পান করিবে? আমার নয়, নাই হ'ক, বাছা জীবিত রহিবে।" বসুদেব ভাবিলেন, "নন্দ ঘোষের সহিত প্রীতি করিয়াছিলাম, আর ত কোথাও আমার কেহ নাই, তাঁহার নিকট সন্তান রাখিয়া আসি।"

বিস্তীর্ণ যমুনা! পারে যাইতে হইবে, তটে আসিয়া অনুভব হইল। কারাগার হইতে বাহিরে আসা অসম্ভব,—সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু যমুনা পার অসম্ভব। অসম্ভব কেন? ঐ না শৃগাল পার হইতেছে? শাবক-স্নেহে শিবা ঘোর দুর্য্যোগ অবহেলা করিয়াছে। শাবক-স্নেহে শিবা যমুনা পার হইবে! জননীস্বরূপিণী শিবা ব্যগ্র—সন্তানকে স্তন-পান করাইবে! মাতার আদর্শ শিবা যমুনা পার হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এ চেষ্টা বিফল হইলে, বিশ্ব লয় হওয়া অতীব যুক্তিসঙ্গত; এ চেষ্টা বিফল হইলে, বিশ্বে মাতার প্রয়োজন নাই; এ চেষ্টা বিফল হইলে, যমুনা-স্রোত মাতৃ-স্নেহ হইতেও বলবান্! —মাতার স্নেহ বলবান্ হইল। শিবা যমুনা পার হইল। মাতৃ-স্নেহ, প্রতিফলিত স্নেহকে পথ প্রদর্শন করিল। বসুদেব সেই পথেই চলিলেন।

যমুনা-পারে নন্দ ঘোষের আলয়। সেই আলয়ে বসুদেব যশোদা-দুলালীর পরিবর্ত্তে হৃদয়-দুলাল রাখিয়া চলিলেন। সন্তান-প্রসবিতা গোয়ালিনী সময়-প্রভাবে নিদ্রাভিভূতা ছিলেন; দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ সন্তান স্তনানুসন্ধান করিতেছে। সন্তান কাঁদে না। ঘোর দুর্য্যোগে যমুনা পার হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে বসুদেবের হস্ত হইতে শিশু যমুনায় পতিত হইয়াছিল। এখন নন্দালয়ে শিশু-সন্তান স্তনানুসন্ধান করিতেছে। যশোমতী পুত্র-সন্তানের মুখ সন্দর্শন করিলেন। আহা! এ পুত্র কি গোয়ালিনী-গর্ভে জন্মিবার সম্ভব? রাজ-বংশ-স্রোতঃ-প্রবাহে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতি ললিত কলেবর, অতি প্রফুল্ল বদন, পদ্ম-পলাশ-লোচন পুত্র, যশোদা বক্ষে ধারণ করিলেন। পিতা-মাতা-পরিত্যক্ত পুত্র মাতা পাইল। বিহ্বলা যশোদার বক্ষে মাতৃ-স্নেহ অনুভব করিয়া স্তন-পান করিতে লাগিল। যশোদা মুগ্ধ, দুদ্দিন-জাত-পুত্রসন্তানও মুগ্ধ,—যশোদার স্নেহময় অঙ্কে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। যশোদার বার্দ্ধক্যের সন্তান; যশোদা একটি প্রদীপ জ্বালেন, সন্তানকে দেখেন, তৃপ্ত হন না; দুটি জ্বালেন, সন্তানকে দেখেন, তৃপ্ত হন না; তিনটি, চারিটি, গোয়ালিনী পাঁচটি দীপ জ্বালিয়া দেখেন, রজনী-যোগে নিত্যই দেখেন, পুত্র কেমন আছে! সেই প্রফুল্ল পদ্ম-পলাশ-লোচন পুত্র, অতি দীন সন্তান, যশোদার কোলে নিশ্চিন্ত

সন্তান, মাতা বৈ আর জানে না। যশোদার মুখ-পানে চায়, দীপালোকে যশোদা দেখেন—যশোদার মন ভরে না। এইরূপ কোটি আলোক, কোটি সহস্র লোচন হইলে, ভাবেন বুঝি সন্তানের রূপ দেখিতে সমর্থ হইবেন; কেননা, যতই দেখেন, সন্তানের আকর্ষণকর-রূপ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হয়। যশোদা গোপাল পালন করিতে লাগিলেন। গোপাল ভিন্ন গোয়ালিনী উচ্চ নাম জানেন না। গোয়ালার সন্তান গো-রক্ষা করিবে, এই যশোদার আশীর্ব্বাদ। কিন্তু আর একটি নাম যশোদার মনে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। শ্যাম-জ্যোতি মণি আছে, তাহার নাম নীলমণি; যশোদা নীলমণি নাম দিলেন। আদরে লালিত সন্তান বড়ই দুষ্ট, কিন্তু মাতা ব্যতীত জানে না, মা-ই তাহার সর্ব্বস্ব। পুত্রের রূপে নন্দ মুগ্ধ, যশোদার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া বক্ষ শীতল করেন। নীলমণি পিতা-মাতার সর্ব্বস্ব। নীলমণিও পিতা-মাতা ভিন্ন জানে না।

যে না পিতা-মাতার অঙ্কে প্রেম শিক্ষা করিল, তাহার দেহ বৃথা, জন্ম বৃথা, সে মনুষ্য না হইয়া কুক্কুর হইলে কোন ক্ষতি ছিল না। যাহার মার মুখ না মনে পড়ে, তাহার পৃথিবীর অতি অল্প ভগ্নাংশই মনে পড়ে। মুক্তযোগী শুকদেব মাতার আশ্রমে মায়া খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিরূপে বিশ্ব থাকিবে, কিরূপে বিশ্ব চলিতেছে, ইহা মাতৃ-স্নেহ অনুভব ব্যতীত উপলব্ধি করা অসম্ভব। যিনি মাতৃপ্রেম পান, প্রেম যাঁহার বাল্যাভ্যাসিত, প্রেমের ক্রিয়া তাঁহার অতি সহজ। নীলমণি, তাই অতি সহজে রাখাল বালককে পরিপ্লাবিত মাতৃ-স্নেহের অংশ দিল। বালকেরা কানাই বৈ জানে না, কানাই বৈ শুনে না, কানাই না মিষ্ট বলিলে বন-ফল মিষ্ট লাগে না। দীন কানাই, কারাগারে পরিত্যক্ত কানাই, রাখাল-সহবাসে দীনের বেদনা বুঝিল। জীবনে আর ভুলিল না। দীন তাহার সর্ব্বস্ব, দীনকে মাতৃ-স্নেহ দিয়াছে।

এই কানাইকে আমরা মথুরাবাসী দেখি। কংস তাঁহার মাতুল। প্রেম-পূর্ণ-প্রাণ ভাগিনেয়, প্রেম-বিতরণ-কর্ত্তা ভাগিনেয় প্রেমই জানে, লোক-ধর্ম্ম জানে না। লোকে কি বলিবে—ভাবিল না, কংসকে বধ করিল। তৎকালে মথুরার অবস্থা অতি মন্দ। সর্ব্বত্র কংসের ভয়;—কংস অতি দুরাত্মা, সেই কারণেই ভয়। কংস জানিত, তাহার বধ-কর্ত্তা জন্মিবে, এই আশঙ্কায় শিশু-বধ হইতেছিল। কংস-বধে নিবারণ হইল। যে নিবারণ করিল, অতি জড় নিয়মে—প্রজার প্রাণ আকৃষ্ট করা অতি অসম্ভব। কৃষ্ণ সকলের প্রাণ আকৃষ্ট করিলেন।

কৃষ্ণ মাতৃ-প্রেমে এখনও পরিপূর্ণ। এখনও তাহার বিতরণ করিলে ক্ষয় হয় না, সমুদ্র হইতে বিন্দু-বিতরণ তাহার দৃষ্টান্ত নয়। কারণ, সমুদ্র হইতে

বিযুক্ত করিলে অন্ততঃ বিন্দু গেল। এ পূর্ণ বিতরণ, পূর্ণ বিতরণে ক্ষয় নাই; পূর্ণ থাকে। মাতৃ-প্রেম-পালিত গোপাল, প্রজার সন্তান রক্ষা করিয়া, প্রেম বিলাইয়া দিলেন। প্রজার বুঝা সম্ভব, গোপাল রাজা হইলেই ভাল হয়, কিন্তু গোপাল রাজা নয়; উগ্রসেন রাজা। যে সমস্ত পরিবার কংস-তাড়িত হইয়াছিল, মথুরায় তাহাদেরই পুনরাধিপত্য হইল। তথাপি গোপাল রাজা হইলেন না কেন? উগ্রসেন কি প্রতিবাদী ছিল? না, উগ্রসেন অতি দুর্ব্বল। উগ্রসেন রাজা হইতে চাহে নাই, গোপালই উগ্রসেনকে রাজা করিলেন! কেন? কারণ, তিনি দীননাথ। গোপালের আচরণে দীননাথ ব্যতীত আর কিছুই আমরা বুঝি নাই। অতি নিষ্ঠুর, অতি ক্রূর, অতি কপট, এই সকল কথাই বলিতে পারিব; কিন্তু দীননাথ নয়—বলিতে পারিব না। দীনের দাস, এ কথায় তাঁহার গুণের ব্যাখ্যা। তাঁহার জীবনে সকলকে পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, কেবল দীনকে পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, দীনের দাসত্ব করিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। দীননাথ বা নিষ্কাম একই কথা।

—কুসুমমালা, ১২৯১

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিংশতি কোটি হিন্দু-সন্তান আজ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কৃষ্ণ-ভাবের ভাবুক। আমাদের আচার-ব্যবহার, আদান-প্রদান, পারিবারিক বা সামাজিক-বন্ধন—সমস্তই কৃষ্ণ-প্রচারিত নিবৃত্তিমার্গে চালিত ও নিয়মিত হইতেছে। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বদন-কমল হইতে যে গীতামৃত বিনিঃসৃত হইয়াছে, উহাই এই ঘোর কলিযুগে হিন্দুজাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। কত বিপদ্‌, কত বিপ্লব, কত ঘাত, কত প্রতিঘাত—কিন্তু হিন্দুজাতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই—কৃষ্ণ-প্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে অমৃত-তত্ত্ব প্রচার করেন, তাহা জীবনের সকল বিভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুজাতির জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সমাজকে নূতন তেজ, নূতন শক্তি, নূতন গৌরব প্রদান করিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া যত ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছে, উহা সমস্তই সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রসূত-জ্ঞান-গঙ্গার বীচি-বিক্ষোভ মাত্র। এইরূপ সুদূরব্যাপী যুগ-প্রলয় সাধন বা সিদ্ধির বলে হইতে পারে না।

পুরাতন যুগের অন্তে নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগ-ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই আমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া অনেকে মানেন বটে, কিন্তু তিনি যে আমাদের নূতন জীবনের মূল—এ তথ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। হিন্দুর জীবন্ত, বহন্ত ইতিহাস তাঁহারই শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহারই শিক্ষা, তাঁহারই ধর্ম্ম, তাঁহারই আদর্শ, হিন্দুর জ্ঞান ও সভ্যতাকে ক্রম-বিকশিত করিয়া ভারতকে পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কি দুর্দ্দশাগ্রস্তই না হইয়াছি! ক্ষুদ্র তড়াগের ন্যায় আজ আমরা অল্পপ্রাণ। তড়াগ স্বল্পতোয়া—সঙ্কীর্ণ গর্ত্তে অবস্থিত নিদাঘ-জ্বালায় সহজে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু আপূর্য্যমাণা ভাগীরথী হিমালয়ের সলিল-গাম্ভীর্য্য হইতে প্রসূতা ও জীবন্ত স্রোতের দ্বারা অবিরত পরিপুষ্টা। প্রখর করমালা উহাকে নষ্ট করিতে পারে না।

আমাদের হীনতা দূর করিবার এক প্রশস্ত উপায় আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহং-বিন্দুগুলিকে কৃষ্ণ-চরণ-বিনির্গত জাতীয়-জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। হিন্দুর ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে প্রসূত। আইস—এই জন্মাষ্টমীর দিনে সেই পারম্পর্য্য স্বীকার করিয়া সকলে কৃষ্ণ-পদ-কল্পতরু-মূলে অভেদ-সূত্রে এক হই। সেই দিনে ভারতের জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতার অধীনতা স্বীকার করিব—যত ঋষি মুনি হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিব—যত অদ্বৈতাচার্য্য ভারতকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব—যত শূর-বীর হিন্দুস্থানকে যশঃ-সৌরভে আমোদিত করিয়াছেন, তাঁহাদের তেজে অনুপ্রাণিত হইব—সেই শুভদিনে সকল মহাজনের অমর-পরম্পরায় আপনাদিগকে মিশাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে এক ভারতব্যাপী যুগব্যাপী নিবেদন অর্পণ করিব। শ্রীকৃষ্ণই হিন্দুর নূতন জীবনের প্রস্রবণ। সেই প্রস্রবণ ছাড়িয়া দিলে ক্রম-ভঙ্গ হইবে—শুকাইয়া মরিয়া যাইতে হইবে। যাহারা মূল-ভ্রষ্ট—যাহারা পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সহিত পারম্পর্য্য-সূত্রে মিলিত নহে, তাহাদের মহানুভবতা মহাপ্রাণতা হইতে পারে না। আজকাল যে বিলাতি সাম্যবাদের বলে একতার আন্দোলন চলিতেছে, উহার গভীরতা অতি অল্প। স্বজাতীয় ইতিহাসে যাহারা কোন আলোক বা শক্তি লাভ করে না, তাহারা ভ্রষ্ট বা বিদ্রোহী।

এই শুভদিনে যাহাতে জনসাধারণ কৃষ্ণ-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন, তাহারই আয়োজন করিতে হইবে। আত্ম-সমর্পণ করিতে গিয়া একটি ছোট আমিকে নিবেদন করিলে চলিবে না। সমগ্র দেশের সহিত—অতীতের

সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনের অনুভূতির সহিত—স্বদেশানুরাগের মত্ততার সহিত এক বিরাট অভেদপ্রাণ নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই মঙ্গল-দিবসে আমি নিজেকে নিবেদন করিব—আমার দেশকে নিবেদন করিব—ভারতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকে নিবেদন করিব—স্বদেশীয় সমস্ত বস্তু নিবেদন করিব। এই উৎসর্গের পর নিবেদিত স্বদেশ-জাত দ্রব্যকে উপেক্ষা করিলে মহাপাতকে পড়িবে—পিতৃপিতামহদিগের অবমাননা করিবে—ও মূলাধার শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী হইবে। এই আত্ম-নিবেদন করিয়া যদি কখন হিন্দুর জ্ঞান ধর্ম্ম সমাজ সভ্যতা ছাড়িয়া চলিয়া যাই—তাহা হইলে আমার নরকেও স্থান হইবে না। কৃষ্ণ-বিদ্রোহীর গতি নাই। এক টুক্‌রা প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করিয়া বিদেশীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে স্বদেশানুরাগ জন্মায় না। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ঋষি-মুনিদিগের সহিত এক হইয়া আপনাকে নিবেদন কর—স্বদেশকে নিবেদন কর—স্বদেশীয় দ্রব্যসকলও নিবেদন কর—দেখিবে যে কৃষ্ণ-প্রভাবে স্বদেশ-প্রেম-বহ্নি তোমার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিবে।

—সন্ধ্যা

নন্দোৎসব

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গোড়ায় একটা কথা বলিব ; যাহারা চাকুরে, যাহাদিগকে দশটা পাঁচটা কাজ করিতে হয়, মনিবের হুকুমে ও কার্য্যে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহাদের দ্বারা হিন্দুয়ানীর কোন কাজ হয় না, তাহারা ঠিকমত হিন্দুয়ানীর কোন উৎসবে যোগ দিতে পারে না। স্বতন্ত্র, স্বাবলম্বী, স্বাধীন-বৃত্তিক, বিশেষতঃ কৃষিজীবী না হইলে বারো মাসে তের পার্ব্বণ করিয়া কেহ হিন্দুয়ানী বজায় রাখিতে পারে না। তাই মনু ব্রাহ্মণের পক্ষে চাকুরী শ্ব-বৃত্তি বা কুক্কুর-বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কিছুতেই চাকরী স্বীকার করিতেন না।

দৃষ্টান্তের হিসাবে নন্দোৎসবের কথা বলিব। গত কল্য হইতে এখন অষ্টাহকাল নন্দোৎসব চলিবে। ব্রতপক্ষের তৃতীয়ার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রকলা আকাশে উদিত হইলে তবে ভক্ত বৈষ্ণবগণ নবকুমার শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমুখ

দর্শন করিয়া নন্দোৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটাইতেন। নন্দোৎসব শেষ করিয়া অনেক জেলার বৈষ্ণব কৃষকগণ আশুধান্য কাটিতে আরম্ভ করেন। ফলে কৃষি-জীবী ও স্বাধীন ব্যাপারী না হইলে নন্দোৎসবের পুরা আনন্দ কেহ উপভোগ করিতে পারে না। তাই ইংরেজের আমলে জন্মাষ্টমী এবং নন্দোৎসবের উল্লাস-আনন্দ বণিক্‌ ও কৃষিজীবি-সম্প্রদায়ের লোকে অধিকতর উপভোগ করে। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল ও আনন্দোৎসব তন্তুবায় এবং ব্যবসায়ী বণিক্‌-সম্প্রদায়ের অর্থ-সাহায্যে হইয়া থাকে। বাঙ্গালার অন্য সকল স্থানে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবের যাহা কিছু আনন্দ-উল্লাস হয়, সে গন্ধবণিক্‌, সুবর্ণবণিক্‌ প্রভৃতি স্বাধীনবৃত্তিক জাতির মধ্যে নিবদ্ধ। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি যে সকল ভদ্রজাতি ইংরেজি শিখিয়া, আধা-সাহেব সাজিয়া, চাকুরীগতপ্রাণ হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুয়ানীর কোন ধার ধারেন না, হিন্দুর উল্লাস-আনন্দে পুরাদস্তুর যোগ দিবার অবসর পান না। ইংরেজি শিখিলে, ইংরেজি বা ইয়োরোপীয় সভ্যতা অবলম্বন করিলে যে, জাতিগত বিশিষ্টতার অপচয় ঘটে—সতাই জাতি যায়—তাহা জাতীয় উৎসব ও উল্লাস-আনন্দের অবসান-সম্ভাবনা দেখিয়া জোর করিয়া বলা চলে। খৃষ্টান যেমনই হউক না, সাধারণ ভাবে বড়দিনের—যীশুর জন্ম-দিনের উৎসবে যোগ দিবেই, সব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন একত্র হইয়া পান-ভোজনে প্রমত্ত হইবেই। আমরা ইংরেজিনবীশের দল জন্মাষ্টমী এবং নন্দোৎসবে কি করিলাম? দুর্গোৎসবে কি করিয়া থাকি? ইংরেজের জাতি আছে, তাই খৃষ্টান-ধর্ম্মে বিশ্বাসী না হইলেও, জাতীয় উৎসবে যোগ দিতে তাহারা ভুলে না। আমাদের জাতি নাই, আমরা জাতি হারাইয়াছি, তাই জাতীয় উৎসব-আনন্দের দিন গবর্নমেন্ট ছুটি দিলেও নিদ্রায় তাহা অতিবাহন করি, অথবা দীর্ঘ অবকাশ পাইলে বিদেশে পালাইয়া যাইয়া সে ছুটির সদ্ব্যবহার করি। আমার জাতি, আমার সমাজ, আমার স্বজন-পরিজন—এই জ্ঞানটা আমাদের হৃদয়ে যদি গাঁথা থাকিত, দেশের দশ জনকে সঙ্গে লইয়া তাহা হইলে আমরা আনন্দ-উৎসবে প্রমত্ত হইতে পারিতাম। জাতি-নাশ ঘটিয়াছে বলিয়াই জাতির প্রতি মমত্ব-বোধ আমাদের নাই; তাই জন্মাষ্টমীর ব্রতে, নন্দোৎসবের বাধাই গানে আমরা যোগ দিতে পারি না।

নন্দোৎসবটা কি? নন্দ মহারাজের একটি ছেলে হইয়াছে, রাণী যশোমতীর ক্রোড়ে এমন কোটি-চাঁদ-নিঙ্‌ড়ান সুধা-মাখান শিশু শোভা পাইতেছে যে তাহার জ্যোতিতে আঁতুড় আলো হইয়া আছে। সে চাঁদমুখ একবার নিরীক্ষণ করিলে নয়ন ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা করে না—সাধ যায় যেন সর্ব্বাঙ্গে কোটি নয়ন ফুটাইয়া অনিমিষ লোচনে কেবল দেখিতে থাকি। স্থির সৌদামিনীর

ন্যায় মা যশোদা বসিয়া আছেন, তাঁহার এলায়িত কুন্তলরাশি নীল আকাশের মত—ঘনাভ্র-বিস্তারের মত বিরাজ করিতেছে—সেই নীলিমার ক্রোড়ে, মেঘ-রাশির ক্ষেত্রের উপর দামিনী-দীপ্তি অচঞ্চলা জননীরূপে দেদীপ্যমান, আর তাঁহারই ক্রোড়ে নব নীরদ-নিন্দিত কান্তিধর, অনন্ত শোভার কেন্দ্রস্বরূপ সুধাময়, সুষমাময় নবজাতক বিদ্যমান। পশ্চাতের অনন্ত নীলিমা হইতে ক্রোড়স্থ অনন্ত, অফুরন্ত নীল-বিন্দুকে যেন স্বতন্ত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে—বিন্দুর মধ্যে যে এমনই ভাবে রূপের অনন্ত ও অপরিমেয় সিন্ধু উথলায়, এমন অঘটন ঘটনা ভক্তগণকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে মা যশোদা স্থির দামিনীরূপে বিরাজমানা। পশ্চাতে অনন্ত, সম্মুখে অনন্ত, মধ্যে অনন্ত রূপের অচঞ্চল বিদ্যুদ্বিকাশ—এ যে অনন্তের ত্রিবেণী-সঙ্গম। ইহারই জন্য কি নন্দোৎসব? কেবল তাহাই নহে। গোকুলের সকল নর ও নারী, কি-জানি-কেন আজ বাৎসল্যরসে যেন ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক ব্রজ-নারী শিশুর দিকে একবার তাকাইয়া মনে মনে যেন স্থির বুঝিতেছেন যে এই সজল-জলদ-নীল, ব্রজ-জন-কুলপাবন শিশু আমারই সন্তান। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক যুবতীর যুগল স্তন-মুখ হইতে শত-ধারায় ক্ষীর-স্রাব হইতেছে, সবাই শিশুকে স্তন্যপান করাইবার জন্য যেন উন্মাদিনীপ্রায়। গোকুলের প্রত্যেক গোপ শিশুকে স্বীয় সন্তান-বোধে কোলে তুলিয়া আদর করিতে উদ্যত। নন্দোৎসব এই বাৎসল্যরসের পূর্ণবিকাশের উৎসব। এমন বাৎসল্যভাবের পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ অভিব্যঞ্জনা পুরাণ-বর্ণিত কোন লীলায় প্রকট হয় নাই। পরের ছেলেকে আমার করিয়া তাহার উপর বাৎসল্যের শতধারা বৃষ্টি আর কোথাও এমন ভাবে প্রকাশ নহে। তাই নন্দোৎসব অপূর্ব্ব এবং অনন্যসাধারণ ব্যাপার। কোন সভ্যজাতির ধর্ম্মে এতটা বাৎসল্যের ছড়াছড়ি নাই। সেই অতুল্য নন্দোৎসব আমরা ভুলিয়াছি—বর্জন করিয়াছি। জাতি কি আছে?

—নায়ক

ঝুলন-যাত্রা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশী হইতে ঝুলন-যাত্রার উৎসব আরম্ভ; পূর্ণিমার দিন শেষ হইবে; সেই দিন আবার রাখী-পূর্ণিমা। ইংরেজিনবীশ-সম্প্রদায়ের মধ্যে

ঝুলন উৎসবের কোন সাড়া পড়ে না, অনেকে হয়ত জানেই না যে এই ঝুলন-পূর্ণিমা, বা ঝুলনটা কি। তাই ঝুলনের খবরটা পাঠকগণকে দিবার চেষ্টা করিব।

হিন্দোল

এই বর্ষাকালে বট-অশ্বথ-কদম্বের ডালে দোলা ঝুলাইয়া দোল খাওয়ার আনন্দ ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে বহু জাতির মধ্যে বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার এক পুরাতন কবি শ্রাবণের হিন্দোল-উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন,—ছেলেমেয়েরা নারিকেল ফুল, গাবফুল, কুমুদ-কহ্লার প্রভৃতির পুষ্পাভরণ পরিয়া দোলায় চড়িয়া দোল খাইতেছে। তাহাদের দোল দেখিয়া দেবতারা বিস্মিত হইয়া নীল-আকাশের কোলে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দোলা যাই দোলের মুখে উপরে উঠিতেছে, অমনি দোলার বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী স্বর্গের অপ্সরীদের দেখিয়া লজ্জায় ফিরিয়া আসিতেছে। কবি উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন যে, বাঙ্গালার কিশোর-কিশোরী স্বর্গের অপ্সরাদের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর, তাই স্বর্গাধিক বঙ্গভূমিই তাহাদের বাসভূমি; তাহারা দোলায় চড়িয়া স্বর্গে উঠিবার চেষ্টা করিলেও বঙ্গভূমির আকর্ষণ তাহাদিগকে মাটিতে নামাইয়া আনিতেছে। এমন অনেক বর্ণনা পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায়। এই হিন্দোল-উৎসব ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল। তাহার পর ইংরেজি-সভ্যতার তাড়নে যেমন অন্য সব সুখ-বিলাস নষ্ট হইয়াছে, তেমনই ঝুলন-যাত্রা লোপ পাইয়াছে। পরন্তু এখনও পশ্চিম প্রদেশের ব্রজমণ্ডলে, অযোধ্যায়, এলাহাবাদ প্রভৃতি জেলায় হিন্দোল-উৎসব প্রবল আছে। কৃষিজীবী হিন্দু, মাঠ-ভরা জল, জল-ভরা পুষ্করিণী ও নদী দেখিয়া, আকাশের নিত্য-স্থির কাল রূপ দর্শন করিয়া, বর্ষার প্রকৃতির প্রৌঢ় গাম্ভীর্য্য দেখিয়া, মেঘের কোলে চপলার মালা নিরীক্ষণ করিয়া, আনন্দে-উল্লাসে অধীর হইয়া হিন্দোলায় দুলিত এবং বাহ্য-প্রকৃতির অনন্ত মাধুরী উপভোগ করিত। এ সব উৎসব গ্রাম্য-জীবনের অনুকূল, কৃষিজীবী স্বাধীন জাতির হৃদ্গত উল্লাসের বিকাশ। এখনকার নাগরিক জীবন, ইষ্টকারণ্যে বাস, অস্বাভাবিক অশন-বসন হিন্দোল-উৎসবের অনুকূল নহে। সে গ্রাম ত দেখি না,—ভাদ্রের ভরা-নদী কাণে কাণে বহিতেছে, গৈরিক-রূপে দুই কূল আপ্লাবিত করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। বিস্তীর্ণ কেদার কান্তার জলে টল্ টল্ করিতেছে, নুতন রোয়া-ধানের গাছগুলি স্বচ্ছ-স্নিগ্ধ হরিৎ শোভায় জলের উপরে জাগিয়া আছে, গাছের পাতাগুলি অনবরত জল-প্রপাতে পরিষ্কার

ও পরিপক্ক হরিৎ শোভায় দুলিতেছে এবং জল-বিন্দুর আকারে মুক্তাফলসকল নিম্নে ভূমির উপর ছড়াইতেছে, আকাশে স্তরে স্তরে মেঘসকল ছুটাছুটি করিতেছে, মাঝে মাঝে বলয়িত বিদ্যুল্লেখায় এক-একটা মেঘের টুকরা যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে, দূরে খণ্ড শৈলের শিখরে শিখরে ময়ুর-ময়ুরী কেকাধ্বনি করিতেছে, বর্হ বিস্তার করিয়া রূপের ছটা ফুটাইতেছে। বর্ষা-বারি-ভারাক্রান্ত পবন-হিল্লোলে কেতকী-পরাগ উড়িয়া আসিয়া প্রাণ মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছে। এ সময়ে না নাচিলে, হিন্দোলায় সবেগে এবং সোল্লাসে না দুলিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারে! তাই উত্তর ভারত বর্ষাকালে হিন্দোল-উৎসবে মাতিয়া উঠে। যখন দেহ ছিল—সবল, সুস্থ, নীরোগ; নর-নারী রূপের এবং সারল্যের বিগ্রহ ছিল, তখন, হিন্দোল-উৎসবে হিন্দু মাত্রেই মাতিত—বাঙ্গালী, বিহারী, ব্রজবাসী, অযোধ্যাবাসী সবাই মাতিয়া নাচিয়া উঠিত। এখন আমরা দুর্ব্বল, দরিদ্র হইয়াছি, মোমের পুতুল হইয়াছি, জল লাগিলেই ব্রণ-কাইকুঁজ হয়, বৃষ্টিতে ভিজিলেই জ্বর হয়, আর ত আমরা প্রকৃতির সন্তান নহি, কৃষিজীবী স্বাধীন জাতি নহি, তাই এমন বর্ষার উপভোগ করিতে পারি না; তাই হিন্দোল বা ঝুলন বাঙ্গালায় একরূপ লোপ পাইতেছে। পশ্চিম দেশেও যেমন দারিদ্র্য বাড়িতেছে, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দূর হইতেছে, তেমনি ক্রমে ক্রমে হিন্দোল-উৎসব লোপ পাইতেছে। সে গালভরা হাসি, বুকভরা উল্লাস, বাহুভরা শক্তি-সামর্থ্য না থাকিলে এ উৎসব-আনন্দ টিকিতে পারে না। যাহারা এই সব উৎসবে মত্ত হইত, তাহারা যে প্রকৃতির মানুষ ছিল, আমরা ত সে প্রকৃতির—সে সামর্থ্যের মানুষ নহি। তাই তাহাদের উৎসব-উল্লাস আমাদের সহে না।

কজরী

এই ঝুলন-উৎসবের সময়ে ব্রজমণ্ডলে কিশোর-কিশোরীরা কজরী গাইয়া থাকে। আমাদের রাঢ়ের কবিগণ উহাকে কাজর বলিয়া গিয়াছেন। কজরী প্রধানতঃ স্বভাবের কৃষ্ণ-রূপের বর্ণনা।—

"কাজর ভাদরে কাজর বাদর,
কাজর আকাশ-বাতাস রে।"

এই কৃষ্ণ-রূপ বর্ণনা করিতে করিতে কজরী পরে আদিরসের গানে পরিণত হয়। কিন্তু কজরী প্রায়ই মেঘমল্লার এবং লগ্নীতে গীত হয়; যাহারা এই বর্ষায় ব্রজমণ্ডলে বন ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা দূর হইতে কজরীর সুর শুনিয়া চমকিত এবং বিস্মিত হইয়াছেনই। কিশোরগণ শ্যামের কৃষ্ণ-রূপ ধারণ করে—কৃষ্ণের

রূপের সোহাগ করে, কিশোরীসকল পাল্টা জবাবে শ্রীমতীর বিদ্যুদ্দামতুল্য রূপের ছটার বিকাশ করিয়া বলেন, দামিনী-দীপ্তি না থাকিলে কি মেঘের শোভা হয় ? যখন কিশোরীসকল গান করে, তখন কিশোরগণ বাঁশী বাজায়, যখন কিশোরগণ গান ধরে, তখন কিশোরীসকল পা নাচাইয়া, নুপুর-ঝঙ্কার করিয়া তাল দেয়। এখনও সে সব সুখ ব্রজমণ্ডলে আছে কি-না জানি না, তবে তাহার স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে। কজরীর রসাভাষ, সুরের উল্লাস এবং উন্মাদনা যে শুনিয়াছে, সে তাহা কখনই ভুলিতে পারিবে না।

তিন যাত্রা

বৎসরে তিনটি পূর্ণিমায় তিন যাত্রা হইয়া থাকে। এক দোল-পূর্ণিমা— দোল-যাত্রা। দ্বিতীয় ঝুলন-পূর্ণিমা—হিন্দোল-যাত্রা। তৃতীয় রাস-পূর্ণিমা— রাস-যাত্রা। তিন যাত্রায় তিন রকমের গতির নির্দ্দেশ আছে। প্রথম স্পন্দন —দোলন ; দ্বিতীয়—হিন্দোল বা প্রবল আন্দোলন ; তৃতীয়—হল্লীষ বা নর্ত্তন। এই তিন গতি হইতে সৃষ্টি-তত্ত্বের তিন স্তরের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুরুষ-প্রকৃতির আকর্ষণ-বিকর্ষণেই সৃষ্টির উন্মেষ। সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণ বাহ্য প্রকৃতিতে যে ঋতুতে যেমন বিকাশ হয়, তখন সেই ঋতুতে তেমন যাত্রা ও উৎসব। প্রথম বসন্তে প্রকৃতির প্রথম উন্মেষ, তখন প্রথম রূপ-বিকাশের মুখে আকর্ষণের প্রথম স্পন্দন—অনুরাগের আবীরে অনুরঞ্জিত হইয়া প্রথম আলিঙ্গন, প্রথম পরিচয়। ইহাই 'দোল-যাত্রা'। হিন্দোল উন্মাদ প্রকৃতির উন্মাদ আলিঙ্গন ; বর্ষায় প্রকৃতির প্রৌঢ় যৌবন, অম্বুবাচীর পরে সে যৌবন লিস্পায় অধীর, তখন নাচিয়া নাচিয়া প্রকৃতি শ্যাম-পুরুষকে আলিঙ্গন করিতে ধায়। তাই হিন্দোলের আন্দোলন উগ্র এবং তীব্র, গাছের ডালের সহিত সমান হইয়া হিন্দোল-সহিত উঠিতে না পারিলে ঝুলনের মজা হয় না। শেষে প্রকৃতি পুরুষ স্বতন্ত্র, কিশোর কিশোরী শান্ত—সাফল্যে স্থির ; কেন না হেমন্ত-ধরা-বক্ষ শস্যসাফল্যে পূর্ণ— সৃষ্টি-কাজ অনেকটা আগাইয়াছে। তখন হল্লীষের নৃত্য বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। নির্ম্মল নীল আকাশে, নির্ম্মল চন্দ্র বিগলিত ধারাস্রাবে ধরা-বক্ষকে আপ্লাবিত করিতেছে, সেই রজত-তরঙ্গের উপরে ইন্দ্রনীলমণি শ্রীকৃষ্ণ কনকরূপিণী শ্রীমতীকে লইয়া নাচিতেছেন। নাচ, নাচ, নাচ—নাচ ছাড়া পুষ্টি নাই, নৃত্য ছাড়া প্রকৃতির উন্মেষ ঘটে না। এই তিন যাত্রায় প্রকৃতির তিন স্তরের নৃত্যের বিকাশ ঘটান আছে।

—বাঙ্গালী, ১৩২৬

মহালয়া

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"*

শাস্ত্রের এই মহাবাক্য ব্যর্থ নহে, ফলশ্রুতিমূলক অতিরঞ্জিত উক্তি নহে। ইহার মধ্যে সনাতন সত্য নিহিত রহিয়াছে। পিতা ধর্ম্ম, অর্থাৎ পিতৃপদ রক্ষা করিতে পারিলে সকল ধর্ম্মই—অর্থাৎ সমাজ-ধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম—সুরক্ষিত হয়; তাই পিতা ধর্ম্মস্বরূপ। পিতা স্বর্গ, অর্থাৎ জীবনে সকল সৎকর্ম্মের পরিণতি স্বর্গ-ভোগেই হইয়া থাকে, সাধুতার সাধ্য ও ঈপ্সিতই স্বর্গ—মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তি, পিতা সেই স্বর্গস্বরূপ, তাঁহাতেই জীবনের সকল সৎকর্ম্মের বিনিয়োগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পিতৃসেবাই পরম তপস্যা—জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। অতএব এ হেন পিতার প্রীতি-সম্পাদন করিতে পারিলে সকল দেবতাই তুষ্ট হইয়া থাকেন। পিতৃসেবাই সকল তপস্যার সার, পিতাই স্বর্গ-সুখের আকর, পিতাই সকল ধর্ম্মের প্রতিমা, পিতাই সর্ব্ব দেবতার প্রতিনিধি। আবার বলি, ইহা সনাতন সত্য কথা,—সর্ব্ব যুগের, সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব জাতির মানুষের পক্ষে এ কথা খাটে। এ সত্য মান্য ও সেব্য। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিব।

আমরা সকল দেশের বুদ্ধিমান্ মানুষে বলিয়া থাকি যে, পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা; তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের পূজ্য, উপাস্য, আরাধ্য ইষ্টদেবতা। কিন্তু সৃষ্টি অনাদি, কবে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। স্রষ্টা ও সৃষ্ট পদার্থ উভয়ই অনাদি; এই অনাদি সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে নাশের লীলাও অনবরত চলিতেছে। নাশ ও সৃষ্টি, এই দুই-এর পরম্পরা লইয়াই সৃষ্টি। সৃষ্টির জনক বলিয়া পরমেশ্বর জগৎ-স্রষ্টা ও আমাদের উপাস্য। কিন্তু সে-সৃষ্টির প্রহেলিকা কেহ দেখে নাই, কেহ দেখিতেও জানে না। পরের মুখে ঝাল খাইয়া আমরা পরমেশ্বরের পূজা করি। বেদ-বাইবেল-কোরাণ প্রভৃতির আপ্তবাক্যই এই অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা; সেই আপ্তবাক্য মানিয়া চলি বলিয়াই আমাদের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের উপাসক। এই সৃষ্টি-প্রহেলিকাও

---

* প্রচলিত মন্ত্রে প্রথমে 'পিতা স্বর্গঃ' ও তৎপরে 'পিতা ধর্ম্মঃ' আছে, কিন্তু স্বগ.তঃ লেখক মহাশয়ের লেখায় ইহা যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, এখানে তাহাই রাখা যুক্তি-যুক্ত বোধ করিলাম।—সম্পাদক।—

আমার আমিত্বের পূর্ণ অপেক্ষা করে। আমি আছি বলিয়াই জগদীশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের লীলা দেখিতেছি। আমি আছি বলিয়াই আমার সৃষ্টি আছে, আমার ঈশ্বর আছে, আমার উপাসনার আকাঙ্ক্ষা আছে। "হম ডুবা ত জগ্ ডুবা"—অর্থাৎ আমি ডুবিলে আমার জগৎ ডুবিয়া যায়—আমি মরিলে আমার সঙ্গে আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। সুতরাং গোড়ায় আমি, তাহার পরে আমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টিকারক পরমেশ্বর। আমিই যখন মূলাধার, তখন জিজ্ঞাসা করি,—আমি কে? কোথা হইতে আমি আসিলাম? কে আমায় আনিল?

আমার আমিত্বের খোঁজ করিতে যাইয়া প্রথমেই দেখিতে পাই, আমার জনক-জননীকে; তাঁহারা না থাকিলে আমি থাকিতাম না—আমি এ জগতে আসিতাম না। দেখিতে পাই, আমার জনক-জননীই আমার স্রষ্টা, আমার সৃষ্টি-কর্ত্তা। যাহার জন্য—যে সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বের জন্য পরমেশ্বর জগৎ-পূজ্য, সেই সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বাগ্রে জনক-জননীতে দেখিতে পাই। আমার সৃষ্টি, আমার আমিত্বের বিকাশ ও বিস্তার আমার জনক-জননীর দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। অতএব আমার জনক-জননীই আমার সৃষ্টি-কর্ত্তা। পিতৃ-শব্দ জনক ও জননী উভয়ের পক্ষে প্রযুজ্য। সুতরাং 'পিতা ধর্ম্ম' শ্লোকে পিতা-মাতা উভয়কেই বুঝাইতেছে। শাস্ত্র আবার মাতৃষোড়শিকায় স্পষ্ট বলিয়া রাখিয়াছেন যে, জননী সাক্ষাৎ জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী দেবী। মা সন্তানের পক্ষে সজীব দেবতা। মায়ের কোলে ছেলে থাকিলে সন্তান সম্রাট্‌কেও অভিবাদন করিবে না। এমন কি, ইষ্ট দেবতা সাকার হইয়া সাধকের সম্মুখে প্রকট হইলে, সেখানে জননী উপস্থিত থাকিলে, অগ্রে জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে হইবে। জীবন্মুক্ত পুরুষের জননী জীবিতা থাকিলে, জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই হইবে। যাহার জননী জীবিতা আছেন, তাহার পক্ষে অন্য দেবতার আরাধনা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বলিতে হয়, উপরের শ্লোকটিতে নিত্য সত্য কথার প্রকাশ করা হইয়াছে।

আমি কে? আমি কেবল একটা দেহ নহি, রক্ত-মাংস-মেদ-বসা-অস্থির সমবায় নহি। আমি একটা জীবন-ধারায় একটি বুদ্‌বুদ্ মাত্র, একটা মনুষ্যত্বের অনন্ত শৃঙ্খলায় একটি আংটা মাত্র। আমার পশ্চাতে অনন্ত অতীত; আমার সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ। আমি ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা বন্ধনী-মাত্র। আমাতে অনন্ত অতীতের সংস্কাররাশি সঞ্চিত, আমা হইতে অনন্ত ভবিষ্যতের সংস্কার-সংবদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রবাহ স্ফুরিত হইবে। আমার আমিত্বের মধ্যে আমার বংশের পরিচয়, জাতির পরিচয়, দেশের পরিচয় সম্পুটিত রহিয়াছে।

আমি ব্যষ্টি, আমার মধ্যে আমাদের দেশের ও জাতির বিরাট সমষ্টি সন্নিবিষ্ট। আমি ব্যষ্টি, এই ব্যষ্টিতেই সমষ্টির বিকাশ। আমি বিন্দু, এই বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধু উথলায়—অনন্তের লীলা প্রকট হয়। ইহাই সৃষ্টির প্রহেলিকা। এই প্রহেলিকা যে বুঝিতে পারে, সে সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝিতে পারে, বিশ্বস্রষ্টার মহিমাও অনুভব করিতে পারে।

আমি কে? "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আমি আমার জনকের আত্ম-স্বরূপ,—সে আত্মার একটা টুক্‌রা। আমার জনক আবার তাঁহার জনকের আত্মা বা আত্মাংশ। এমনই অনন্ত পরম্পরায় বিশ্ব-আত্মা আমাতেই নিহিত। সেই বিশ্ব-আত্মা আমাকে যিনি দান করিয়াছেন, তিনিই আমার জনক—আমার পিতা। এই পিতৃত্বের ও পুত্রত্বের পরম্পরায় বংশের ধারা সৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে আরও একটু মজা আছে; পিতামহ ও পৌত্র সহোদর-সম্বন্ধে সংবদ্ধ; প্রপিতামহ ও প্রপৌত্রে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ নিত্য বিরাজিত।

এই হিসাবে পিতা-পুত্রের পরম্পরা বংশের ধারার সর্ব্বত্রই প্রকট রহিয়াছে। পিতা বলিলে বংশ বুঝায়, পিতা বলিলে বংশের ধারা বুঝায়; পিতা বলিলে জনক-জননী বুঝায়, পিতা বলিলে আমাকেও বুঝায় এবং আমার জগতের স্রষ্টাকেও বুঝায়। পিতা জগদীশ্বরের নাম, পিতা আমার ঈশ্বরের নাম। পিতা না থাকিলে কি সৃষ্টি হয় কিংবা সৃষ্টি বজায় থাকে! তাই

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এখন জিজ্ঞাসা করি, তর্পণ করি কেন? তর্পণ কি? যাহার দ্বারা তৃপ্তি হয়, তাহাই তর্পণ। আত্ম-তৃপ্তিই তর্পণের পারিভাষিক শব্দ। আত্ম-তৃপ্তি হয় কিসে? বলিয়াছি ত, আমি কে, চিনিলেই আত্ম-তৃপ্তি ঘটিতে পারে। আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সমবায়ে আমি, আমার পিতা ও পিতামহের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সমন্বয়ে আমি। তাঁহারা সবাই আমাতে আছেন, আমি তাঁহাদের সকলের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে চিরদিনই ছিলাম, এখন তাঁহাদের বংশধর-রূপে, জলপিণ্ডের অধিকারিরূপে প্রকট হইয়াছি। সুতরাং তাঁহাদের নামের আবৃত্তি করিলে, তাঁহাদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তিলাঞ্জলি দান করিলে, আমার আত্ম-বোধ ফুটিয়া উঠিবে, আমার বংশানুক্রম (heredity) প্রকট হইবে, আমি আমাকে চিনিতে পারিব, স্মৃতির সাহায্যে আমার আমিত্বের প্রসারটা বুঝিতে পারিব, আমার তৃপ্তিবোধ হইবে—আমার তর্পণ হইবে। কেবল আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল লইয়াই ত আমার আমিত্ব নহে। আমার আমিত্বের বিকাশ

আমার দেশের পুরাণেতিহাসে, আমার দেশের মানব-শ্রেষ্ঠগণের প্রভাবে হইয়া থাকে। তাই ভীষ্ম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি মনুষ্য-শ্রেষ্ঠের তর্পণ করিতে হয়; দেশের যাহারা যুদ্ধে, অগ্নিদাহে, সর্পাঘাতে, মহামারীতে বা অন্য যে-কোন উপায়ে মরিয়াছে, যাহাদের বংশের ধারা নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই তর্পণ করিতে হয়। আমি ত কেবল দেশের নহি—আমি বিশ্বের;—তাই দেশ ছাড়িয়া বিশ্বের তর্পণ করিতে হয়। আমি ত কেবল বিশ্বের নহি—বিশ্বাত্মার, তাই "তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্"—বলিয়া বিশ্বাত্মার তুষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইবে জানিয়া, বিশ্বরাটের তর্পণ করিতে হয়।

ইহাই তর্পণ। আমিত্বের উন্মেষই তর্পণের উদ্দেশ্য, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তর্পণের সাধনা। সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে আমি আমাকে ছড়াইয়া বিলাইয়া দিয়া আত্মহারা হইয়া বেড়াই, নবদ্বার দিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তি ঘটাইয়া আমি ইন্দ্রিয় ও আসক্তির পথে আত্মহারা হইয়া ছুটাছুটি করি, তর্পণ আমার সেই আমিত্বের টুক্‌রাগুলিকে সঞ্চয় করিয়া, এক 'ঠাঁই' গোছাইয়া আমাকে দেখাইয়া দেয়। আমি যে ছোট নহি, এতটুকু নহি, নশ্বর নহি—মরি না, মরিতে পারি না, মরিবও না—এইটুকু তর্পণ আমাকে বুঝাইয়া দেয়। তর্পণ জাতির জাগরণ, আত্ম-পরিচয়ের উন্মেষসাধন। দেবনিদ্রার কালে পাছে মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, আত্মহারা হইয়া বিহ্বলভাব ধারণ করে, তাই পিতৃপক্ষে তর্পণ। পিতৃযান ও পিতৃলোকের কথা নাই বলিলাম, শাস্ত্রের সাহায্যে পরকালের যবনিকা ছিন্ন করিয়া অপর পারের কথা নাই তুলিলাম; তাহা ত বিশ্বাস করিবে না; সে দেশের কোনও সমাচার ত রাখ না; সে পারের কোনও ঘটনা ত তোমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে। কিন্তু তুমি ত আছ—তোমার তুমিত্বের বিচার করিতে হইলে তর্পণের প্রয়োজন হইবেই। তোমার তুমিত্বের বিশ্লেষণ করিতে হইলে পিতার কথা মনে পড়িবেই। তাই আজ পক্ষকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, সকল হিন্দু-গৃহে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে—নদীতীরে, বাপীতটে, তীর্থক্ষেত্রে "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" মহাবাক্য প্রতিদিন প্রভাতে উচ্চারিত হইতেছে। হিন্দুর এই সমবেত কণ্ঠের কাতর-ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া বিশ্বরাটের চরণে যাইয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তর্পণ জাতীয়তার প্রথম সোপান, সৌভ্রাত্রের বেদী; তর্পণ সমগ্র হিন্দুজাতিকে এক করিয়া দেয়, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হিন্দুর নিজস্ব করিয়া দেয়। তর্পণ জাতি-সংহতি এবং বিশ্ব-সংহতির মূলমন্ত্র—মহাবাক্য—মহাসাধনা।

মহালয়ার দিনে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে—শ্রীপদচিহ্নে পিতৃ-পিণ্ড অর্পণ করি কেন? এই একপক্ষ কাল তর্পণ করিয়া বুঝিতে পারি, এই বিরাট্

বিশ্বটা আমার আলয় মহালয় ;—এই বিরাট্ বিশ্বটা আমার আমিত্বের আশ্রয় ও লয় হইবার আধার। আমি বিশ্বে আছি, বিশ্ব আমাতে আছে। কিন্তু তোমাকে—শ্রীবিষ্ণুকে কোথাও ত খুঁজিয়া পাই না। তিনি যে অবাঙ্‌মনস-গোচর। তিনি যে অব্যয়, অক্ষয়, অনন্ত, অজ্ঞেয়, অরূপ। তাঁহাকে ত কোথাও খুঁজিয়া পাই না। পরন্তু আমার তৃপ্তি তাঁহাতে, তাঁহার তৃপ্তি আমাতে। কোথায় তুমি? খুঁজিয়া দেখিতে পাই, আমার অহঙ্কার-রূপ গয়াসুরের মাথার উপরে তোমার পদ-চিহ্ন বিরাজ করিতেছে। সে চিহ্ন আছে বলিয়া আমি মাথা হেঁট করিয়া আছি। সে চিহ্ন আছে বলিয়া উন্নত ফণি-ফণার মত আমার মদ-মাৎসর্য্য গগন ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে না। শ্রীবিষ্ণুর সেই শ্রীপাদপদ্মে আমার আমিত্বের মাধুরী ফুটাইবার জন্য, আমাকে বিনামূল্যে বিকাইবার সাধে আমি পিতৃপিণ্ড দিয়া থাকি। বলিয়া থাকি—হে দীননাথ, জগন্নাথ—আমার প্রভু,—আমার জনক,—আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়তনে তোমারই স্থান ; আমি আমার মধ্যে তাঁহাকে আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি তাঁহার হইলেও তজ্জাত হইলেও, বিলাসে, ব্যসনে, অনুচিকীর্ষায় তাঁহাকে আমাতে ফুটাইতে পারি না। তিনি আমাতে প্রকট হইলে, আমার প্রতি তুষ্ট হইলে আমার সর্ব্বস্ব অমৃতায়মান হইবে। যখন এই সংসার-অরণ্যে বিভ্রান্ত হইয়াছি, পথ হারাইয়াছি, তখন তোমার পদ-চিহ্নে তাহার তুষ্টি-সাধনার জন্য জলপিণ্ড দিলাম—তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। গয়াধামে শ্রীচৈতন্যদেবই ব্রাহ্মণের মত পিণ্ড দিয়াছিলেন, তাই পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই হারানিধি পাইয়াছিলেন। সে নিধি বাঙ্গালীকে দিবার জন্য, ভারত-বাসীকে বিলাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন। আবার তেমনই করিয়া তর্পণ করিবার সময় আসিয়াছে, আবার তেমনই ভাবে গয়াধামে পিতৃপিণ্ড দিবার কাল আসিয়াছে। নহিলে আর যে আমাদের বংশের ধারা বজায় থাকে না, বিশিষ্টতা রক্ষা পায় না। তাই বলি, আজ বল বাঙ্গালী, গঙ্গাস্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে গললগ্নীকৃতবাসে করজোড়ে আবার তেমনই করিয়া বল—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

—নায়ক, ১৩২৩

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব

বিপিনচন্দ্র পাল

প্রাচীনেরা দুর্গাকে যে-চক্ষে দেখিতেন, সে-চক্ষু আমরা হারাইয়াছি। "দুর্গা! দুর্গা!" বলিতে তাঁদের চক্ষে জল, শরীরে পুলক, হৃদয়ে ভক্তি, প্রাণে বল, আত্মাতে আরাম আসিত। দুর্গা-নামের সে-শক্তি আমাদের নিকটে আর নাই। তাঁরা যে-ভাবে দুর্গাপূজা করিতেন, আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। অথচ এই পূজার সময়ে আমাদের মনটাও কেমন কেমন করিয়া উঠে।

জানি না কেন, শরতের প্রাতঃকাল বড় মিষ্টি লাগে। শরতের বাল-সূর্য্য প্রাণের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কত সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। শরতের বায়ু কাণে কাণে কি কথা কহিয়া যায়, বুঝি না; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে কি যেন একটা সাড়া পড়ে। আমরা পূজা ছাড়িয়াছি। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশ্বাস হারাইয়াছি। মনকে যত কেন চোক ঠার দেই না, প্রতিমায় সত্য সরল ঈশ্বর-বুদ্ধি আমাদের হয় না। তবুও কেন, পূজার সময়ে চারিদিকে যখন পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে অলক্ষিতে আমাদের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও, প্রাণ নাচিয়া উঠে।

সকলের হয় ত এমনটি হয় না। কিন্তু এটি যার হয় না, তার বড় দুর্ভাগ্য নয় কি? আমাদের ছেলেপিলেরা এ বস্তু নিঃশেষে হারাইতেছে বলিয়া, তাদেরকে কৃপাপাত্র বলিয়া মনে হয়। তাদের মতবাদ হয় ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মতবাদ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর হইবে। তাদের তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত হয় ত তাহাদের পিতামহদিগের তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও সমধিক সত্যোপেত হইবে। তারা হয় ত বিশুদ্ধতর ঈশ্বর-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু কেবল মতে বা সিদ্ধান্তে ধর্ম্ম-জীবনের বুনিয়াদ গড়ে কি?

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অতিপ্রাকৃতে। যাহা চক্ষে দেখি, কাণে শুনি, হাত দিয়া ধরি,—যাহা এ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি, যাহা এই মনের দ্বারা চিন্তা করি, যাহা লইয়া আমাদের প্রতিদিনের আহার-বিহারাদি সম্পাদন করি, তাহার অতীতে, আপাতত তাহা হইতে পৃথক্, আর একটা কিছু আছে, তাহার কিছুই দেখি শুনি না, অথচ তাহা আছে অনুভব করি; তাহার কিছুই ধারণা হয় না, অথচ তাহা যে নাই এমন ভাবিতে পারি না; তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে;—এই যে বিশ্বাস, এই যে ধারণা, এই যে ভাব, ইহাই মানুষের ধর্ম্মের মূল বুনিয়াদ। এটি যে

হারাইল, তার সব গেল। তার কেবল ধর্ম্ম গেল যে তাহা নয়, তার সর্ব্বস্ব গেল। সে মনুষ্যত্বের অধিকার নিজের হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া, সাধারণ পশুত্বের ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইল। আর দুর্গোৎসব যেমন করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে এই অতিপ্রাকৃতের ভাবটি জাগাইত, এমন আর কিছুতে করিত না। তারই আমেজ এখনও প্রাণের মধ্যে লাগিয়া আছে বলিয়া এই পূজার সময় প্রাণের ভিতরটা অমন করিয়া নড়িয়া চড়িয়া উঠে।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা

প্রতিমা-পূজা বাঙ্গালার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের আর কোথাও এ ভাবের মূর্ত্তিপূজা নাই। অন্যত্র দেবতার মূর্ত্তি আছে, কিন্তু সে-সকল মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। সে-সকল মূর্ত্তি সর্ব্বদা রহিয়াছে। যজমানেরা পর্ব্বাহে কিংবা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে দেউলে যাইয়া দেবতার পূজা করিয়া আসে। তাদের ঘরে ঠাকুরের প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা হয় না। বাঙ্গালায়ও দেউল আছে, পীঠস্থান আছে। সেখানে দেবতার মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন সে-মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু এ-সকল বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্ম-জীবনের মূল প্রস্রবণ নহে। এগুলির দ্বারা বাঙ্গালী-চরিত্র গড়িয়া উঠে নাই। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর চরিত্র, বাঙ্গালীর সংসার ও পরমার্থ গড়িয়া উঠিয়াছে তার নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনা ও নৈমিত্তিক পূজাদির দ্বারা। আধুনিক জ্ঞানের চক্ষে এই প্রতিমা-পূজা হীন এবং হেয় হইলেও, ভাবের রাজ্যে ও রসের রাজ্যে এ সকলের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

ত্রিবিধ বৈদান্তিক উপাসনা

প্রাচীন বেদান্তে তিন প্রকারের উপাসনার বিধান আছে। প্রথম স্বরূপ-উপাসনা, দ্বিতীয় সম্পদুপাসনা, তৃতীয় প্রতীকোপাসনা। আত্মার উপাসনা স্বরূপ-উপাসনা। আত্মার মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি, নিজের স্বরূপেতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারলাভ, অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, ধ্যানযোগে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভব করা, ইহাই স্বরূপ-উপাসনা। এই উপাসনা কেবল সমাধির অবস্থাতেই সম্ভব হয়। এই উপাসনার জন্য সকল ইন্দ্রিয়ের একান্ত নিরোধ আবশ্যক। সর্ব্বেন্দ্রিয়-চেষ্টার নিঃশেষ নিবৃত্তি না হইলে এ উপাসনা সম্ভব হয় না। ইহা যোগের পথ। যতক্ষণ না সাধকের এই অবস্থা-লাভ হইয়াছে, যতক্ষণ না তাঁর ইন্দ্রিয়সকল নিবৃত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে স্তব-স্তুতি প্রভৃতির আবৃত্তি করিতে হয়। বেদান্তে এ পথও প্রদর্শিত হইয়াছে।

তন্ত্রেতেও এই সকল স্তুতি-বন্দনার উপদেশ আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্রহ্ম-স্তব এই স্বরূপ-উপাসনার দ্বার-স্বরূপ। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর দেবী-স্তবও তাহাই। সে কথা পরে বলিব। কিন্তু এই স্বরূপ-উপাসনা উচ্চ অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। নিম্নতর অধিকারীর পক্ষে ইহা অসাধ্য। যাঁরা এই স্বরূপ-উপাসনার অধিকার লাভ করেন নাই, অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিবার শক্তি জন্মে নাই, যাঁহারা এখনও গভীর ধ্যান সাধন করেন নাই, তাঁহাদের জন্য সম্পদুপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুইটি বস্তুর মধ্যে কোনও সামান্য ধর্ম্ম থাকিলে, সেই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর বস্তুর চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা বৃহত্তর বস্তুর জ্ঞান-লাভ ও ধ্যান-ধারণার চেষ্টা করাই সম্পদুপাসনা। স্বরূপ-জ্ঞানের উপরে স্বরূপ-উপাসনার প্রতিষ্ঠা। আর সম্পদ্-জ্ঞানের উপরে এই সম্পদুপাসনার প্রতিষ্ঠা। বালকেরা ভূগোল পড়িবার সময় পৃথিবীর আকারকে কমলালেবুর আকারের মতন ভাবিতে শিখে। পৃথিবীর সঙ্গে কমলালেবুর আকার-সামান্য আছে। পৃথিবীর আকার আমাদের চক্ষুর্গ্রাহ্য নহে। জ্যোতির্বিবদেরা গণিতের দ্বারা এই অদৃশ্য ও অদৃষ্ট পৃথিবীর আকার-আয়তনাদির প্রতিষ্ঠা করেন। এই গণনার দ্বারা তাঁরা ঠিক করিয়াছেন যে, পৃথিবী পূর্ব্ব-পশ্চিমে গোল বা বৃত্তাকার, কিন্তু তার উত্তর-দক্ষিণ একটু চাপা। এইটি স্থির করিয়া তাঁরা তাঁহাদের পরিচিত কমলালেবুর আকারের সঙ্গে পৃথিবীর আকারের সাদৃশ্য রহিয়াছে বুঝিলেন। তখন জন-সাধারণকে পৃথিবীর আকার কিরূপ, ইহা বুঝাইতে যাইয়া, কমলালেবুর সাহায্য লইলেন। এই-ভাবে কমলালেবুর আকার দেখাইয়া পৃথিবীর আকারের যে জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাকে বেদান্তে সম্পদ্-জ্ঞান কহে। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সূর্য্য, মন, প্রাণ প্রভৃতির সাহায্যে এই সম্পদ্-জ্ঞানলাভ হইতে পারে। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু। ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়াতীত। ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচর। বাক্য, মনের সহিত তাঁহাকে খুঁজিতে যাইয়া, না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই ব্রহ্মের সঙ্গে কিন্তু এই যে দৃশ্যমান সূর্য্য, তাহার একটা সামান্য-ধর্ম্ম আছে। পরম চৈতন্যরূপে ব্রহ্ম স্ব-প্রকাশ এবং বিশ্ব-প্রকাশক। সূর্য্যও জ্যোতিষ্করূপে স্ব-প্রকাশ, আপনি উদিত না হইলে, কেহ কোনও কিছুর দ্বারা সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। আর সূর্য্যও জগৎ-প্রকাশক। সূর্য্য উদিত হইয়া একই সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশিত করেন এবং চক্ষুর্গ্রাহ্য জগৎকেও প্রকাশিত করেন। এইজন্য স্ব-প্রকাশত্ব- ও জগৎ-প্রকাশত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের একটা গুণ-সামান্য বা ক্রিয়া-সামান্য আছে। এই গুণ-সামান্যকে আশ্রয় করিয়া, সূর্য্যের এই স্ব-প্রকাশত্ব ও জগৎ-প্রকাশত্ব ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া, সূর্য্যের ধ্যান-সহায়ে ব্রহ্মের ধ্যান করা, সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া

ব্রহ্মের চিন্তা করা, সম্পদুপাসনা। এইরূপে মনের উপাসনা, প্রাণের উপাসনাও সম্পদুপাসনা। যে বস্তুর সঙ্গে ব্রহ্মের যত অধিক গুণ-সামান্য থাকে, তাহার আশ্রয়ে ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠতর সম্পদুপাসনা বলিয়া গণ্য হইবে। এইজন্য সূর্য্যোপাসনা অপেক্ষা মনোপাসনা, মনোপাসনা অপেক্ষা প্রাণোপাসনা, প্রাণোপাসনা অপেক্ষা আত্মবান্ সদ্‌গুরুর উপাসনা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতর উপাসনা বলিয়া গণ্য হয়। সূর্য্যাদির উপাসনা অপেক্ষা এইজন্য অবতারাদির ভজনা অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইঁহাদের সঙ্গে ব্রহ্মের স্বরূপের সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বেদান্ত-মতে অবতার-পূজা ও তান্ত্রিক-মতে গুরু-পূজা উভয়ই সম্পদুপাসনার অন্তর্গত। আর এই অবতার-পূজা এবং গুরু-পূজাই শ্রেষ্ঠতম সম্পদুপাসনা।

প্রতীকোপাসনা

নিম্নতম অধিকারীর জন্য প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা। বেদান্ত এই প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাসজনিত উপাসনা বলিয়াছেন। অধ্যাস অর্থ—অন্যত্রদৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ। একস্থানে যে বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, অন্যত্র—যেখানে প্রকৃতপক্ষে তাহা নাই, সেখানে—তাহার সত্তার আরোপ করার নাম অধ্যাস। জঙ্গলে সাপ দেখা গিয়াছে, ঘরের পৈঠায় দড়ী পড়িয়া আছে, এই দড়ীতে ঐ পূর্ব্ব-দৃষ্ট সর্পের সত্তা আরোপ করা বা কল্পনা করার নাম অধ্যাস। এই অধ্যাস প্রতীকোপাসনার প্রাণ। যে ঈশ্বরতত্ত্বের বা ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান পূর্ব্বে অন্য সূত্রে লাভ হইয়াছে, তাহাকে সম্মুখের ঘটপটাদিতে কল্পনা করিয়া, সেই ঘটপটাদির পূজাই প্রতীক-পূজা। ঈশ্বরতত্ত্বের বা ব্রহ্মতত্ত্বের যে পূর্ব্ব-জ্ঞানের উপরে এই প্রতীক-পূজার প্রতিষ্ঠা হয়, এই জ্ঞান নিতান্ত অপরোক্ষ জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে সাধকের অন্তরে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের কোনওরূপ সাক্ষাৎ-জ্ঞান জন্মে নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। এ জ্ঞান শোনা-জ্ঞান মাত্র; এ জ্ঞান শব্দ-জ্ঞান, বস্তু-জ্ঞান নহে। এই শ্রুত-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রতীকোপাসনা হইয়া থাকে। এই প্রতীকোপাসনাতে কেবল অতি-প্রাকৃতের অনুভূতির অনুশীলন হয় মাত্র। কোনওরূপ সত্য ঈশ্বর-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-জ্ঞান ইহা হইতে জন্মে না।

প্রতীকোপাসনা ও তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি

ফলতঃ কেবলমাত্র প্রতীকোপাসনার দ্বারা তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি হইতেই পারে না। যাঁরা হয় মনে করেন এবং কোনও কোনও সর্ব্বজন-পূজনীয় সাধক এ-পথে

সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলেন, তাঁরা প্রতীকোপাসনার সঙ্গে অন্য যে-সকল সাধন-ভজন অবলম্বিত হয়, তাহার কথা তলাইয়া দেখেন না। এদেশে কেবল প্রতীকের পূজা কেউ করে না। দিনে প্রতীকের পূজা একবার মাত্র হয়। কিন্তু সন্ধ্যা-বন্দনা তিনবার করিতে হয়। সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রও স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী জপ করেন। অন্যেরা গুরু-দত্ত মন্ত্র জপ করেন। এ-সকল মন্ত্র ঈশ্বর-প্রতিপাদক বা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। এই সকল ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, মন্ত্রে তাঁরা তন্ময়ত্ব লাভ করেন। মন্ত্র তাঁহাদের সর্ব্বময় হইয়া উঠে। এইভাবে এই নাম বা জপ-মন্ত্র যখন তাঁহাদিগকে নিঃশেষে আচ্ছন্ন ও একান্তভাবে অধিকার করে, যখন তাঁহাদের দেহ-মন-প্রাণ এই অজপার প্রভাবে মন্ত্রময় ও নামময় হইয়া উঠে, তখন তাঁহারা যোগ-সমাধির অবস্থা লাভ করেন। এইভাবে এই পথেই তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন, প্রতীকোপাসনার দ্বারা নহে। তাঁদের অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বাহিরের লোকে জানে না। বহির্মুখ লোকে সে খবর রাখে না। সুতরাং কেবল তাঁদের ক্ষণকালের বাহিরের সাধন-ভজন দেখিয়া, তাহারই ফলে সিদ্ধিলাভ হয়, এরূপ মনে করে।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজাকে কিন্তু ঠিক প্রতীকোপাসনার শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তিকে প্রতীক বলা যায় না। অন্যদিকে এগুলিকে বেদান্তোক্ত সম্পদুপাসনার অবলম্বন-রূপেও গ্রহণ করা অসম্ভব। সম্পদুপাসনার গুণ-সামান্যটা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব হওয়া চাই। কালী, দুর্গা প্রভৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের সেরূপ কোনও প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব গুণ-সামান্য আছে, একথা ত বলা যায় না। আমাদের এ-সকল প্রতিমা-পূজাকে ফলতঃ বেদান্তের সম্পদুপাসনা বা প্রতীকোপাসনা, কোনও শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এগুলি খাঁটি প্রতীকোপাসনাও নহে, খাঁটি সম্পদুপাসনাও নহে। এগুলি একটা মিশ্র বস্তু। এখানে প্রতীকে-সম্পদে অদ্ভুত রকমে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। আর এই মাখামাখিটা বাঙ্গালীর ভাবুকতার বিশেষ ফল। এ-সকল প্রতিমা-পূজার মধ্যে বাঙ্গালী-চরিত্রের বিশেষত্বটি অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এ-সকল প্রতিমা-পূজার ঐতিহাসিক তত্ত্ব পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করুন। এগুলি চীন হইতে আসিয়াছে, না তিব্বত হইতে আসিয়াছে, না আমাদের মাটি হইতেই জন্মিয়াছে; এগুলির সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের ও ভিন্ন ভিন্ন শাখার বৌদ্ধ-সাধনার সম্পর্ক কি ও কতটা; এগুলি প্রাচীন না অর্ব্বাচীন; এ-সকল

কথার বিচার প্রত্নতত্ত্ববিদেরা করিতেছেন। সে-সকল কথা আমি সাক্ষাৎভাবে বেশী জানি না। তার আলোচনা আমার সাধ্যাতীত এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। যেখান হইতেই আদিতে এই প্রতিমা-পূজা বাঙ্গালাদেশে আসুক না কেন, এখন যে-আকারে এ-সকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর হাতে-গড়া বস্তু। এই প্রতিমা-পূজার মধ্যে বাঙ্গালী আপনার রস ও ভক্তি সঞ্চার করিয়া, তাহাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। আর এখানেই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়াছে। এগুলির মূল ও পূর্ব্ব-ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমান আকার ও উদ্দীপনা বাঙ্গালীর দেওয়া। পরের ঘর হইতে আসিলেও, বাঙ্গালী এগুলিকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে। না করিলে, এগুলির এই মর্ম্ম ও মর্য্যাদা থাকিত না।

বাঙ্গালী কবি। আমরা কবির জাত। কবি-কল্পনা বস্তুটি আমাদের অস্থিমজ্জাগত। ইহাতে বাঙ্গালীর ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সে-বিচার যে করিতে চাহে, করুক। কেহ কেহ ভাবেন, জানি, যে বাঙ্গালী অমন ভাবপ্রবণ না হইলেই তার পক্ষে ভাল ছিল। তাহা হইলে সে শিখ বা মারাঠার মতন একটা ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত। ইঁহারা শিখের বা মারাঠার জাতীয় চরিত্রের দাঁড়িপাল্লায় বাঙ্গালীকে চড়াইয়া তার ভাল-মন্দের ওজন করেন। এরূপ ওজন আমি করি না। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট করিয়া আমি তাহাকে বড় করিতে চাই না। কেউ আপনার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া এ জগতে বড় হইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। এজন্য বাঙ্গালীর ভাবুকতা, অপরের অপর গুণের তুলনায়, ভালই হউক আর মন্দই হউক, অতি মহার্ঘ বস্তু বলিয়া মনে করি। এটি গেলে বাঙ্গালীর সব গেল। আর বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, কবির জাত বলিয়াই বাঙ্গালীর ধর্ম্ম অমন মিষ্ট। এইজন্য বাঙ্গালার শাক্তও ভক্তির হিসাবে বৈষ্ণবের চাইতে কোনও দিন ছোট হন নাই। এইজন্য বাঙ্গালার প্রতিমা-পূজা বেদান্তের পুরাতন উপাসনার সকল শ্রেণীবিভাগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

প্রতিমা-পূজার মর্ম্ম

মধ্যযুগের বৈদান্তিক মায়াবাদী বাঙ্গালী নিজেও এই প্রতিমা-পূজার নিগূঢ় মর্ম্ম ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। এইজন্যই নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত বলিয়া, এগুলির পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সত্য-ভাবে যে প্রতিমা-পূজা করিতে পারে, সে ত নিম্ন অধিকারী নয়, সে যে শ্রেষ্ঠতম অধিকারী।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"

সাধকদিগের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া এ-সকল প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,—সকলেই এ-কথা বলেন। কিন্তু এই পুরাতন শ্লোকের মর্ম্ম যে কি, ইহা অতি অল্প লোকেই তলাইয়া দেখেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়,—"সাধকানাং হিতার্থায়"—সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত। কিন্তু "সাধক" কাহারা? মানুষমাত্রেই ত সাধক নয়। সাধক হইবার আগে, "সাধ্য-" নির্ণয় আবশ্যক। যার সাধ্য-নির্ণয় হয় নাই, তাহাকে সাধক বলা যায় কি? সাধকাবস্থা ধর্ম্ম-জীবনের প্রথমাবস্থা নহে, দ্বিতীয় অবস্থা। ধর্ম্মের প্রথম অবস্থাকে সাধুরা প্রবর্ত্তাবস্থা বলিয়াছেন। এই প্রবর্ত্ত-অবস্থা অতিক্রম করিলে, পরে সাধকের অবস্থা লাভ হয়। এই প্রবর্ত্তাবস্থাতেই সাধ্য-নির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম-তত্ত্ব নিরূপিত হইবার পূর্ব্বে সাধনারম্ভ হয় না, হইতেই পারে না। সাধন আরম্ভ না হইলে, কেহ সাধক হয় না, হইতেই পারে না। অতএব সাধকের অবস্থা ধর্ম্মের নিম্নতম অবস্থা নহে। সাধক নিম্ন-অধিকারী নহেন। তাঁর চাইতে নিম্ন-অধিকারী প্রবর্ত্তাবস্থায় যে আছে, সে। আর যে প্রবর্ত্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করে নাই, অর্থাৎ যার কোনও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই, সে নিম্ন-অধিকারীও নহে; একান্ত অনধিকারী। এ সংসারে জিজ্ঞাসুর সংখ্যা অতি কম, হাজারে একজনও মিলে কি না সন্দেহ। সাধন-ধর্ম্মে সাধারণ লোকের কোনই অধিকার জন্মে না। তারা নিম্ন-অধিকারী নহে, অনধিকারী।

"সাধকদিগের" হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়, এ যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই রূপ-কল্পনা সাধারণ লোকের জন্য নয়, ইহা মানিতেই হইবে। তারপর, এ কল্পনা করে বা করিবে বা করিতে পারে, কে? ব্রহ্মের এ-সকল রূপ কাহার দ্বারা কল্পিত হয়, এ প্রশ্নটা কেউ তোলে না। এই প্রশ্নটা তুলিলেই এ-সকল প্রতিমা-পূজার মূল মর্ম্মটা খুলিয়া যায়। কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ যে জানে, যে সে-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে-ই কেবল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে পারে, অন্যে পারে কি? রূপ বলিলেই যে স্বরূপ আসে। বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান যার নাই, সে কি কখনও তার রূপ আঁকিতে পারে? অতএব ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা করিতে গেলে, তাঁর স্বরূপের প্রত্যক্ষ-লাভ প্রয়োজন। যিনি রূপ-কল্পনা করিয়াছেন বা করেন, তিনি ব্রহ্ম কি, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে সাধকের হিতার্থে এই রূপের কল্পনা হইল বা হইয়াছে, সে সাধক সেই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ

কি ইহা শুনিয়াছেন, কিন্তু দেখেন নাই। এই যোগাযোগ হইলে পরে তবে—'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—সম্ভব এবং সার্থক হয়।

প্রেম-ধর্ম্ম ও প্রতিমা-পূজা

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—বলিয়া যাঁরা প্রথমে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁরা নিজেরা কেবল সাধক নহেন, কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ ও রসের উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকেই বাহিরে ফুটাইতে যাইয়া এই সকল প্রতিমার প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল ভিতরে, কেবল সমাধিতে সে বস্তুকে দেখিয়া তাঁদের তৃপ্তি হয় নাই। সমাধি ত দেহীর নিত্য-অবস্থা নহে। সমাধি ভাঙ্গিলেই ইষ্টদেবতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদের কালে তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-সমক্ষে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই এই সকল রূপ-কল্পনা হইতে লাগিল। যাঁরা রূপ-কল্পনা করিলেন, তাঁরা প্রথমে নিজের সাধনের জন্যই ইহা করেন, অপরের জন্য নহে। এই কল্পিত রূপ তাঁহাদের সম্ভোগের বস্তু হয়। ভক্ত আপনার ইষ্টদেবতাকে কেবল প্রাণের ভিতরে দেখিয়াই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। আপনার সাধনের ধনকে কেবল ধ্যান ও সমাধিতে পাইয়াই তাঁর সাধ মিটে না। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হন। যে ইন্দ্রিয়-চেষ্টার একান্ত নিবৃত্তি করিয়া প্রথমে তিনি আপনার ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, পরে অন্তরে অন্তরে তাঁর সঙ্গে নিগূঢ় আলাপ-পরিচয় হইলে, বাহিরেও, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে না পারিলে, তাঁর আনন্দ ও তৃপ্তি যেন পরিপূর্ণ হয় না। সকল প্রেমের সম্বন্ধেতেই এটি হইয়া থাকে। প্রণয়িযুগল প্রথমে নিভৃতে, দু'জনার একাকিত্বের মধ্যে, একান্ত অব্যবহিত-ভাবে পরস্পরকে পাইতে চাহে। তখন বাহিরের সম্বন্ধসকল প্রেম-সম্ভোগের অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। তখন অপর কাহারও দৃষ্টি তাহাদের সহ্য হয় না। কিন্তু ক্রমে এমন সময় আইসে যখন বিশ্বের মাঝে, বিশ্বের জন-সঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম হইয়া, তারা নিজেদের প্রিয়তমকে দেখিতে চাহে। নিভৃতে প্রিয়তমকে নিজের হাতে সাজাইয়া, একেলা সে রূপ দেখিয়া তাদের আর তৃপ্তি হয় না; জগৎকেও দেখাইতে ইচ্ছা হয়। সকল প্রেমিকের মধ্যেই এক সময়ে না এক সময়ে প্রেমের এই বহির্ম্মুখীনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্তরের সম্ভোগকে বাহিরে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা সাধারণ প্রেম-ধর্ম্ম। এই ব্যাকুলতা কবিদিগের মধ্যে

সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই ব্যাকুলতা সাধকেরও হয়। আর প্রেমিক, সাধক, কবি ইঁহারা সকলে যে একই-জাতীয় জীব। কবি প্রাণের ভিতরে যে রূপের বা রসের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহাকে বাহিরে ফুটাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। এ অস্থিরতা, এ বেদনা প্রসূতির প্রসব-বেদনার মতন। এ ব্যাকুলতা, এ বেদনা সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য বিধান। এ বেদনা প্রেমিকে জানেন। এ বেদনা কবি জানেন। এ বেদনা সাধকেও ভোগ করিয়া থাকেন। এই বেদনার মধ্য দিয়াই কবির অন্তরের রস-মূর্ত্তি শব্দে ও বর্ণে, ছন্দে ও সঙ্গীতে বাহিরে ফুটিয়া উঠে। ইহারই ভিতর দিয়া সাধকের ধ্যান-মূর্ত্তি প্রতিমার রূপে আবির্ভূত হন। বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রেমধর্ম্মের এই সাধারণ প্রকৃতিটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

ভাবাঙ্গ-গঠন ও প্রতিমার সৃষ্টি

প্রেমিক, কবি, সাধক সকলেই আপনাপন প্রাণের এই রস-বস্তুকে বাহিরে প্রতিষ্ঠা করিতে চান বটে, কিন্তু পারেন না। এ যে বাহিরের বস্তু নয়। এই রূপ যে অতীন্দ্রিয়। এই লাবণ্য যে ভাবের, বর্ণের নহে। এই সৌন্দর্য্য যে রসের, গঠন-পারিপাট্যের নহে। এ বস্তু অনঙ্গ, ভাবাঙ্গেতেই কেবল ফুটিয়া উঠে। সে ভাবাঙ্গের পরিপূর্ণ আলোক-চিত্র বা ফটোগ্রাফ তুলিতে পারে, এমন যন্ত্র দুনিয়ায় নাই। মা আপনার মর্ম্ম-পটে সন্তানের যে রূপ দেখেন, বাহিরের চিত্র-পটে তাহাকে পরিপূর্ণ রূপে ফুটাইয়া তোলেন, এ শক্তি বিধাতা তাঁহাকে দেন নাই। প্রেমিক-প্রেমিকা প্রাণ-পটে আপনার প্রেম-পাত্রীর বা প্রেম-পাত্রের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেন, কোনও চিত্র-পটে তাহাকে নিঃশেষে অঙ্কিত করিতে পারেন না। কবি আপনার প্রাণের ভিতরে যাহা দেখেন, এমন শব্দ ও ছন্দ আজিও জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার দ্বারা সে-বস্তুর পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ফুটাইতে পারা যায়। এইজন্য রস-মূর্ত্তি মাত্রেই একটা অতৃপ্তি জাগাইয়া রাখে। এ রাজ্যে ব্যর্থ চেষ্টাই সার্থক, নিষ্ফল প্রয়াসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করে।

সংসারের রসের সম্বন্ধসকল বিশিষ্ট-আধারকে ধরিয়া ফুটে; কিন্তু এ-সকল আধারকে ছাপাইয়া উঠে। সাগর-দৃশ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গগুলি দিগন্ত-প্রসারিত হইয়া ক্রমে অনন্ত আকাশের গায়ে মিলিয়া মিশিয়া যায়, মানুষের রসের সম্বন্ধসকলও সেইরূপ বিশিষ্টকে ধরিয়া গড়িয়া উঠে, কিন্তু গড়িতে গড়িতেই ক্রমে নির্ব্বিশেষে যাইয়া মিশিয়া পড়ে। মাতার স্নেহ ক্ষুদ্র শিশুকে

ধরিয়াই প্রথমে ফুটে, কিন্তু ক্রমে বাৎসল্যের অলখনিরঞ্জন বিশ্বরূপেতে যাইয়া মিশিয়া যায়। তখন সকল সন্তান, বিশ্ব-সন্তান তাঁর বাৎসল্যের মূর্ত্তি হইয়া উঠে। কিন্তু এ ত মূর্ত্ত নহে। বিশিষ্ট সন্তানই মূর্ত্ত, সাকার; বিশ্ব-সন্তান একই সঙ্গে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার। প্রথমে যে আধারকে আশ্রয় করিয়া সন্তানের মাতৃভক্তি জাগিয়া উঠে ও বাড়িতে থাকে, তাহা বিশিষ্ট বস্তু, সন্দেহ নাই। এ যে আমার মা। প্রথমে কা'রও সঙ্গে ভাগাভাগি সহ্য হয় না। আর কেউ তাকে মা বলিয়া ডাকিলে প্রাণ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু ক্রমে যখন সন্তান আপনার ভক্তি-বলে প্রাণের মধ্যে মাকে পরিপূর্ণ-ভাবে পায়, তখন তার এই বিশিষ্ট জননীর মধ্যে সে বিশ্ব-জননীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এক কণ্ঠে মা বলিয়া তার প্রাণ জুড়ায় না। জগৎ-জোড়া সে মা-নাম শুনিতে চায়। তখন দুনিয়ার লোককে ডাকিয়া, মা-ডাক শুনিবার জন্য তার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। তখন তার বাহিরের মাতৃরূপ অন্তরের মধ্যে বিশ্বমাতা-রূপে ফুটিয়া উঠেন। তখন সে যে মাতৃমূর্ত্তি আঁকিতে চায়, তাহা কেবল তার নিজের মা নয়, সকলের মা। কেবল মানুষের মা নয়, সকল জীবের মা, সকল সৃষ্টির মা। এই মা মূর্ত্তও নহেন, অমূর্ত্তও নহেন। এই মাকে সাকারও বলিতে পারি না, নিরাকারও বলিতে পারি না। এই মা একই সঙ্গে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত; সাকার ও নিরাকার। মূর্ত্তকে ছাড়িয়া অমূর্ত্ত শূন্য, মিথ্যা, বন্ধ্যা-পুত্রবৎ অলীক-কল্পনা। অমূর্ত্তকে ছাড়িয়া মূর্ত্ত অপূর্ণ, অর্থহীন, শুষ্ক জড়-পিণ্ড, মৃত্যুর ক্রীড়নক মাত্র, অমৃতের প্রেরণা তাহাতে পাওয়া যায় না। সত্য যাহা, বস্তু যাহা, তাহা যুগপৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার। যতটুকু যখন প্রকাশিত হয়, ততটুকুই তখন মূর্ত্ত ও সাকার; আর যাহা প্রকাশিত হয় না, তাহা সর্ব্বদাই অমূর্ত্ত ও নিরাকার। কিন্তু প্রকাশ যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া তার পেছনে যাহা অপ্রকাশিত আছে, তার কোনও সন্ধান পাওয়া সম্ভব কি? প্রকাশ ও সত্তা, রূপ ও স্বরূপ, গতি ও শক্তি, আবির্ভাব ও ভাব, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার, সসীম ও অসীম—এ সকল একে অন্যকে ছাড়িয়া কদাপি থাকে না। এই যুগ্ম বস্তুকেই প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ ছায়াতপের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশিষ্ট সন্তান মূর্ত্ত; বিশ্ব-সন্তান অমূর্ত্ত। বিশিষ্ট জননী মূর্ত্ত; বিশ্ব-জননী অমূর্ত্ত। বিশিষ্ট সখা মূর্ত্ত, বিশ্ব-সখা অমূর্ত্ত। বিশিষ্ট নায়ক ও বিশিষ্ট নায়িকা মূর্ত্ত, বিশ্ব-নায়ক ও বিশ্ব-নায়িকা অমূর্ত্ত। এক ও এক যোগ করিয়া যেমন দুই হয়, এ-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সন্তান বা মাতা, সখা বা প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে যোগ করিয়া তাদের যোগফল-রূপে বিশ্ব-সন্তান বা বিশ্ব-মাতা বা বিশ্ব-সখা

বা বিশ্ব-নায়ক বা বিশ্ব-নায়িকা প্রকাশিত হয় না। গণিতের পথে এই বিশ্ব-বস্তুর সন্ধান মিলে না। সে পথ জীবনের পথ। ইহার সঙ্কেত গণিতে নাই, জীব-তত্ত্বেই কেবল ইহার আভাস পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এক করিয়া তাদের যোগফল-রূপে জীব-বস্তুকে বা জীবন-বস্তুকে পাওয়া যায় না। এই জীবন প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে, অথচ প্রত্যেক অঙ্গকে ছাড়াইয়া, সকল অঙ্গসমষ্টির মধ্যে, অথচ সে সমষ্টিকে অতিক্রম করিয়া আছে। এই জীবনের ছাপ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরে আছে। এই জীবনের প্রেরণায়, এই জীবন-বস্তুকে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। এ বস্তু সকলের নিয়ামক, সকলের নিয়তি, অঙ্গসকল এই অনঙ্গ বস্তুকেই প্রকাশ করে, এই অনঙ্গ বস্তুকে পাইয়াই অঙ্গের সার্থকতা-লাভ হয়। বিশ্ব-সন্তান, বিশ্ব-মাতা, বিশ্ব-সখা, বিশ্ব-নায়ক ও বিশ্ব-নায়িকা-সম্বন্ধেও ইহাই খাটে। প্রত্যেক বিশিষ্ট সন্তান, মাতা, সখা ও প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মধ্যে এই বস্তু আছে। এই বস্তুকে প্রত্যেক বিশিষ্ট সন্তানাদি প্রকাশ করে, কিন্তু কেহই নিঃশেষ করিতে পারে না। এই অমূর্ত্ত রস-বিগ্রহই সন্তানাদির ছাঁচ, তাহাদের বিকাশ-গতির নিয়ন্তা। ইহাই বাৎসল্যাদি রসের সার্থকতা-লাভের এক ও অনন্য-নিদান। সখ্য-বাৎসল্যাদির রস-মূর্ত্তিসকল এই অমূর্ত্ত রস-বিগ্রহকেই ফুটাইতে চেষ্টা করে।

বৈদিক দেব-বাদ ও উপনিষদের ব্রহ্ম-জ্ঞান

এ জগতের সর্ব্বত্র বিশিষ্টে ও বিশ্বজনীনে, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে, সাকারে ও নিরাকারে, রূপে ও স্বরূপে এই অদ্ভুত মাখামাখি রহিয়াছে। আর বিশিষ্টের মধ্যে বিশ্বজনীনকে, মূর্ত্তের মধ্যে অমূর্ত্তকে, সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, রূপের মধ্যে স্বরূপকে ধরিবার চেষ্টা করিতে যাইয়াই মানুষ তার যাবতীয় ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। অতি আদি-কালে মানবের শৈশব-সাধনা মূর্ত্তের মধ্যেই অমূর্ত্তকে নিঃশেষে ধরিতে যাইয়া ইন্দ্র-বরুণ, ইলোহিম-জিহোভা, অহিমান-অহর্মজদা প্রভৃতি পুরাতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইন্দ্র-বরুণাদি চাক্ষুষ দেবতা ছিলেন। কিন্তু চাক্ষুষ হইলেও, তাঁদের সবটা মানুষ দেখিতে পাইত না। যাহা দেখিত, তার মধ্যেও একটা রহস্য জাগিয়া থাকিত। তখন এ-সকল চাক্ষুষ দেবতার মধ্যে ঐ রহস্যটুকুই অতীন্দ্রিয়ের ও অমূর্ত্তের সঙ্কেতটি জাগাইয়া রাখিত। ক্রমে মূর্ত্ত হইতে অমূর্ত্ত, চাক্ষুষ হইতে অচাক্ষুষ, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহা হইতে যাহা

ইন্দ্রিয়াতীত, পৃথক্ হইয়া পড়িল। তখন মানুষের ভেদ-বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিল। সে 'হাঁ ও না'র রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। যাহা হাঁ, তাহা না নয়; যাহা সৎ তাহা অসৎ নয়, যাহা মৃত তাহা অমৃত নয়, যাহা মর্ত্ত্য তাহা অমৃত নয়, যাহা পরিণামী তাহা নিত্য নয়, এইভাবে সে দুনিয়াটাকে কাটিয়া চিরিয়া ভাগ করিল। দেবতাকে খুঁজিতে যাইয়া সে যাহা কিছু দেখে, তাহাকেই তখন নেতি নেতি বলিয়া বিদায় দিতে লাগিল। না-টা তখন হাঁ অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ অসৎ; এই আছে, এই নাই। অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞেয় কিংবা শুদ্ধ সত্তামাত্র-জ্ঞেয়। এইজন্য অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত হইতে, স্বরূপকে রূপ হইতে, অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়-জগৎ হইতে একান্ত পৃথক করিতে যাইয়া, মানুষ এক মহাশূন্যে, এক প্রলয় অন্ধকারে পড়িয়া গেল। এই অন্ধকারে ও মহাশূন্যে তার প্রাণ হাহাকার করিতে লাগিল বটে, কিন্তু জ্ঞান পরিষ্কার হইল। আদিতে সে রূপের আর স্বরূপের প্রভেদ বুঝে নাই। এবারে বুঝিল, রূপ আর স্বরূপ ভিন্ন বস্তু। তবে বিবেক জাগিল বটে, কিন্তু প্রাণ জুড়াইল না। তখন সে সেই মহাশূন্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া, তাহা হইতে সকল রূপের সার শ্রীকে ও সকল রসের নিদান অমৃতকে তুলিল। ব্যতিরেকী পথে যাইয়া মানুষ নিরাকারে, অরূপে, শূন্যে পৌঁছিয়াছিল। এবারে ফিরিয়া অন্বয়ী পন্থা ধরিয়া আসিয়া সকল আকারকে সেই নিরাকারের দ্বারা, সকল রূপকে সেই অরূপের দ্বারা, সকল শূন্যকে সেই পরিপূর্ণের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। আমাদের প্রাচীন উপনিষদের সাধক এই অবস্থা লাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই চঞ্চল বিষয়-রাজ্যকে আচ্ছাদন করিয়া তিনি এই ঈশ্বরের সঙ্গে যাবতীয় কাম্যবস্তু ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার এই শ্লোক হইল—

> সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
> পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ
> ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্মকে যিনি আপনার নিগূঢ়তম অন্তরের শ্রেষ্ঠ আকাশে নিহিত জানিয়াছেন, তিনি এই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সমুদায় কাম্যবস্তু ভোগ করেন।

ভক্তি-সাধন ও রস-মূর্ত্তি

কিন্তু ইহাতেও তাঁর সকল আশা পূরিল না, সকল সাধ মিটিল না। ইহাতে বিষয়-রস শুদ্ধ, নির্ম্মল, ভক্তিসিক্ত হইল মাত্র। কিন্তু যাঁহার রসের কণামাত্র পাইয়া এ-বিষয় এমন মিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে ভাল করিয়া, প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করা গেল না। পরম সুন্দর যিনি, যাঁর সৌন্দর্য্যের ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আভা পাইয়া জগতের সকল সুন্দর বস্তু অমন মিষ্ট হয়, তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ হইল না। অন্তরের মধ্যে, প্রাণের ভিতরে, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও, চক্ষে তাঁহাকে দেখা গেল না। অথচ চক্ষুর ঐটিই গভীরতম পিপাসা। চক্ষু চারিদিকে সেই অলখনিরঞ্জনের রূপই যে খুঁজিয়া বেড়ায়। যতক্ষণ মনে করে এই মুখে, এই দেহে, এই বিগ্রহে, এই আধারে সেই রূপ লুকাইয়া আছে, ততক্ষণ লুব্ধ মধুপের মতন চক্ষু নির্ণিমেষে তাহার উপরে বসিয়া থাকে। দর্শনে ধ্যানে তাহাতেই ডুবিয়া রহে। কিন্তু যখন দেখিল, এই রূপে সেই রূপ নিঃশেষে লুকাইয়া নাই, তখন ইহাকে ছাড়িয়া অন্যমুখে যাইয়া বসিল। ইহাই ত জীবের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের কারণ। ইন্দ্রিয় যাহা চায়, তাহা পায় না বলিয়াই ত এরা অমন উড়ো উড়ো ভাবে অস্থির হইয়া বিষয়ে বিষয়ে ঘুরিয়া মরে। ভিতরে পাইয়া সাধ পূরিল না। বাহিরে ঘুরিয়াও প্রাণ জুড়াইল না। তখন সাধক ভিতর-বাহির এক করিবার জন্য অস্থির হইলেন। তখন তিনি রূপে ও অরূপে, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে, সাকারে ও নিরাকারে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যে ও অতীন্দ্রিয়ে, সজাগে ও সমাধিতে মাখামাখি করিয়া আপনার ইষ্ট-মূর্ত্তি রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

আদিতে দৃষ্টে ও অদৃষ্টে, চাক্ষুষে ও অচাক্ষুষে, সাকারে ও নিরাকারে, সসীমে ও অসীমে, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে একটা মাখামাখি ছিল। বৈদিক দেব-পিতৃবাদে শৈশব-জীবনের সেই স্মৃতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সে মাখামাখি ছিল অল্প জ্ঞানের ভূমিতে। তখন বিবেক জাগে নাই। আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। সে মাখামাখি ছিল প্রদোষের আধা-আলো আধা-আঁধারের সৃষ্টি। এ মিশামিশি তাহা নহে। এখানে জ্ঞান পূর্ণ হইয়াছে। এখানে অনাত্মে আত্মভ্রম, আত্মাতে অনাত্মবুদ্ধি নাই। এ মাখামাখি অজ্ঞানতার বা অল্প-জ্ঞানের সৃষ্টি নহে। ইহা রসের সৃষ্টি। এখানে রসে মাখামাখি হইয়া জড় ও চেতন, চাক্ষুষ ও অচাক্ষুষ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার এক হইয়াছে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—

ঈশ্বরের দ্বারা এই সকলকে আচ্ছাদন করিতে হইবে—এখানকার উপদেশ এ নয়। এখানকার কথা—এই সকলের দ্বারা ঈশ্বরকে ফুটাইয়া তুলিতে

হইবে। এখানকার কথা এ নয় যে "সকল কামনাকে ব্রহ্মের সঙ্গে ভোগ করিবে।" এখানকার কথা—"ব্রহ্মকে সকল কামনার সঙ্গে ভোগ করিবে।" পূর্ব্বকার কথা ছিল—অরূপের দ্বারা রূপকে ভোগ করিবে। এখনকার কথা হইল—রূপের দ্বারা অরূপকে ধরিবে। পূর্ব্বকার কথা ছিল—অশব্দের দ্বারা শব্দকে, অরসের দ্বারা রসকে, অগন্ধের দ্বারা গন্ধকে, অস্পর্শের দ্বারা স্পর্শকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। এখনকার কথা হইল—শব্দের দ্বারা অশব্দকে প্রবুদ্ধ করিবে; রসের দ্বারা অরসকে পূর্ণ করিবে; গন্ধের দ্বারা অগন্ধকে ফুটাইবে; স্পর্শের দ্বারা অস্পর্শকে প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে টানিয়া ধরিবে। কোথায় আনিলে, ঠাকুর! এ উল্টা পথে চলি কেমন করিয়া? অসহায় সাধকের আর্ত্ত প্রার্থনাতে ভক্ত-বৎসলের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের বনে বনে, হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে পশিয়া, সে বংশীধ্বনি প্রাণ-যমুনাকে উজান বহাইতে লাগিল। তখন অরূপে রূপ ফুটিল, অশব্দে শব্দ জাগিল, অগন্ধে গন্ধ বহিল, নিরাকারে আকার গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এ আকার জড় নহে, মানস-বস্তু। ইহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, শুদ্ধ ধ্যান-গম্য। আর এ আকারও হঠাৎ ফুটে না, তিলে তিলে অদৃশ্য হইতে দৃষ্টিপথে ফুটিতে আরম্ভ করে।

ছবি ফুটাইতে হইলে, প্রথমে পট প্রস্তুত করিতে হয়। পটে আগেকার যদি কিছু দাগ, লেখা বা রং থাকে, সকলের প্রথমে তাহা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। পটখানিকে শাদা করিতে হয়। তার পরে তাহাকে এক-রঙ্গা করা আবশ্যক হয়। ইষ্ট-মূর্ত্তির প্রকাশের পূর্ব্বে সাধকের চিত্ত-পটও এরূপ এক-রঙ্গা হইয়া থাকে। তখন সর্ব্বজীবে সাধকের ব্রহ্ম-ভাবের উদয় হয়। স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ের উপরে একটা অভূতদৃষ্ট আলোর আভাস পড়ে। তখনই সাধক

> স্থাবর জঙ্গম দেখে, দেখে না তার মূর্ত্তি।
> যাঁহা নেত্র পড়ে, হয় ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি॥

এখনও কিন্তু ভাব গাঢ় হয় নাই। চক্ষে নূতন রসের কাজল মাখিয়াছে মাত্র। দৃষ্টি খুলিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই। সমাধিতে সাধক তত্ত্ব-বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সমাধি ভাঙ্গিলে যখন তাঁর মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আবার বিষয়-রাজ্যে ফিরিয়া আসে, তখন কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সমাধির নেশা তাঁর চক্ষে লাগিয়া থাকে। এই অবস্থাতেই বৈষ্ণব মহাজন-পদে শ্রীরাধার তমাল দেখিয়া কৃষ্ণ-ভ্রম হইয়াছিল। এখানে তত্ত্ব-বস্তুর অরূপত্ব দূর হইয়া, সর্ব্বরূপত্ব লাভ হইয়াছে মাত্র। এখানে ভাব ফুটিয়াছে, ভাব গাঢ়, ঘন হইয়াছে;

কিন্তু এখনও ভাবাঙ্গ গড়িতে আরম্ভ করে নাই। অনুভব হইতে ভাব ফুটে। ভাবাঙ্গ গড়ে কেবল অনুভূতি নয়, কিন্তু কল্পনা। কল্পনা অনুভূতিকে লইয়া, ভাবেতে অঙ্গ-যোজনা করিতে আরম্ভ করে। ধ্যানে, সমাধিতে সর্ব্ব-মাতৃত্বের অনুভব হইল। সমাধি-ভঙ্গে প্রথমে যার উপরে চক্ষু পড়ে, তাঁকেই মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিলে, এ ভাব রক্ষা করা কঠিন হইল। ভেদ-জ্ঞান জন্মান ইন্দ্রিয়ের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। অথচ প্রাণ সেই সর্ব্ব-মাতৃরূপকে চাক্ষুষ করিবার জন্য আকুল হইল। কল্পনা তখন সর্ব্ব-মাতৃরূপ গড়িতে লাগিল। এই ভাবেই মাতৃ-প্রতিমার উৎপত্তি হইল। সাধক পরের জন্য নয়, নিজের প্রাণের দায়ে, আপনার গভীরতম অন্তরঙ্গ অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া, অচাক্ষুষ তত্বকে চাক্ষুষ করিবার চেষ্টায়, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভোগ করিবার লালসায়, কল্পনা-সহায়ে মানস-মূর্ত্তি রচনা করেন। এটি ভক্তি-পন্থার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। নিতান্ত নিরাকারবাদিগণ পর্য্যন্ত এ-পথে চলিতে যাইয়া ব্রহ্মের মানস-মূর্ত্তি রচনা করেন। নিরাকারের উপাসক যখন আপনার ইষ্টদেবতাকে "পিতা নো'সি" বলিয়া প্রণাম করেন, অথবা উপাসনা-কালে "মা!" "মা!" বলিয়া চক্ষু-জলে মুখ-বুক ভাসাইয়া দেন; তখন বস্তুতঃ ব্রহ্মের একপ্রকার মানস-রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। পিতা, মাতা, সখা প্রভৃতি বস্তু নিরাকার নহে; আর পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, সখিত্ব প্রভৃতিও সাকার পিতা, মাতা বা সখা প্রভৃতিকে ছাড়িয়া কোথাও প্রকাশিত হয় না। মার রূপ হইতে যখন আমরা মাতৃত্ব-ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া ভাবি, তখনও একটা কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি করি। আবার এই যে বিশিষ্ট মাতা বা পিতা বা সখা, ইঁহাদের প্রত্যক্ষ স্নেহাদির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া যখন বিশ্ব-মাতা বা বিশ্ব-পিতা বা বিশ্ব-সখার কথা ভাবিতে থাকি, তখনও মানস-কল্পনার সৃষ্টি করি। সুতরাং এক গভীর সমাধিতে যে সত্য স্বরূপ-উপাসনা হয়, তাহা ছাড়া—যখন, যে ভাবেই, আমরা ব্রহ্মোপাসনা করিতে চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই এই মানস-কল্পনার হাত এড়াইতে পারি না। তবে আমরা যাহাকে সচরাচর নিরাকারোপাসনা বলি, তাহাতে এই মানস-কল্পনা হাল্‌কা, বিমানচারী হয়; তাহাতে ভাব মাত্র ফোটে, ভাবাঙ্গ গড়িতে পারে না। এই মানস-কল্পনাই আর একটু বস্তুতন্ত্র, আর একটু গভীর ও গাঢ় হইলেই প্রতিমারূপে গড়িয়া উঠে। আধুনিক কালের নিরাকারোপাসনার অন্যতম প্রধান আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এইটি বুঝিয়াছিলেন। তাই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—সাধক দেখিলেন প্রাণের মধ্যে মাকে, ডাকিলেন ভাবাবেগে—

"মা!" "মা!" দাঁড়াইয়াছিল কুমার তাঁর নিকটে, সে গড়িল অমনি প্রতিমা।

ইহাই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার ভিতরকার ইতিহাস। এইজন্যই বাঙ্গালী যে-সকল প্রতিমার পূজা করে, তাহাকে বেদান্তের সম্পদুপাসনাও বলা যায় না, প্রতীকোপাসনাও বলা যায় না। ইহা একটা স্বতন্ত্র বস্তু। ইহা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-জ্ঞানের পূর্ব্বকার কথা নয়, পরের কথা। ইহা ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধন নহে; ব্রহ্ম-জ্ঞানের সম্ভোগ। জ্ঞানের দ্বারা অথবা অজ্ঞানের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ভাবের দ্বারা, রসের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা এই সকল গড়িয়া উঠিয়াছে। অজ্ঞানী, অভক্তের হাতে পড়িয়া এ-সকল প্রতিমা-পূজার অশেষ দুর্গতি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। সিদ্ধপুরুষের অধিকারে যে-বস্তুর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কেবল অসিদ্ধ নহে, কিন্তু অপ্রবর্ত্ত অজ্ঞ লোকের হাতে পড়িয়া তার অশেষ প্রকারের কদর্থ লাভ হইয়াছে, ইহা সত্য। এইজন্যই এগুলি ভক্তি-সাধনের সহায় না হইয়া অনেক স্থানে অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এখন মনস্তত্ত্বের বা Psychologyর দিক্ দিয়াই এ সকলের বিচার-আলোচনা করা আবশ্যক। আর তাহা করিতে যাইয়াই দেখি যে সকল প্রতিমা-পূজার যে ব্যাখ্যা কিছু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা সত্য নহে। এ প্রতিমা-পূজা জ্ঞান-সাধনের সহায় নহে, ভক্তির সৃষ্টি ও ভক্তি-সাধনের অবলম্বন।

ভক্তির পথ রসের পথ। সুতরাং রস-কলামাত্রেই ভক্তি-সাধনের অঙ্গ। বিশেষতঃ বাঙ্গালার ভক্তি-সাধন বহুদিন হইতেই এই রসের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। এইজন্য বাঙ্গালার প্রধান ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তি-সাধন "সাহিত্য-দর্পণ," "কাব্য-প্রকাশ" প্রভৃতি রস-শাস্ত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলীর "উজ্জ্বল-নীলমণি" একই আধারে রস-তত্ত্ব এবং ভক্তি-তত্ত্ব দু'ই। আর "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থ এই রস-তত্ত্বেরই সাধনাদি প্রচার করিয়াছেন। এ পথ শাক্তের পথ নহে, ইহা সত্য। সাক্ষাৎভাবে শক্তি-উপাসনা এই রস-তত্ত্বের উপরে গড়ে নাই, ইহা জানি। কিন্তু বাঙ্গালার শক্তি-উপাসকেরা যে ভক্তি-সাধন করিয়াছেন, পরোক্ষভাবে তাহার উপরে এই ভক্তি-তত্ত্বের ও ভক্তি-পথের প্রভাব যে খুবই পড়িয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর এইজন্যই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় বলিয়া জানি না।

বাঙ্গালী যে প্রতিমার পূজা করে, তাহাকে বেদান্তের পরিভাষায়, এইজন্যই প্রতীকোপাসনাও বলিতে পারা যায় না, সম্পদুপাসনাও বলিতে পারা যায় না। প্রতিমা প্রতীক নহে। শালগ্রাম প্রতীক। শালগ্রামে নারায়ণ-বুদ্ধি ধ্যান

করিয়া জাগাইতে হয়। দেখিবামাত্র তাহাতে দেবতা-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-বুদ্ধি জন্মে না, শিলা-জ্ঞানই জাগ্রত হয়। শালগ্রামে শিলা-জ্ঞানই বস্তুতন্ত্র, দেবতা-বুদ্ধি কল্পিত, "অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ"। এইজন্য শালগ্রাম-পূজা প্রতীকোপাসনা। দুর্গোৎসবেও প্রতীক আছে। সে প্রতীক নবপত্রিকা। নবপত্রিকার মন্ত্রই তার প্রমাণ। যুগ্মবিল্বফলযুক্ত বিল্বশাখা এই নবপত্রিকার দেহ। এই শ্রীফলবৃক্ষ "অম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ"। এই শ্রীফল-শাখাতে দুর্গার অধিষ্ঠান কল্পিত হইয়া, তাহা দুর্গার প্রতীকরূপে পূজিত হয়। এই নবপত্রিকা-পূজা দুর্গার প্রতীকোপাসনা। কিন্তু দুর্গা-প্রতিমা প্রতীক নহে। সম্পদ্‌ও নহে। তাহা রূপক মাত্র। দুর্গা বিশ্ব-মাতা, "জগতাং ধাত্রী"। ত্রিজগতের ধাত্রী, বিশাল বিশ্বের জননীরূপেই দুর্গার ধ্যান হয়।

> অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
> চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

এ ধ্যান ত সকলেই করিতে পারে। যে এ-ভাবে সৃষ্টির পরম তত্ত্বকে না দেখিল, সে ত কিছুই দেখিল না। উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্ম-জ্ঞানও ত এই বস্তুকে বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। "যেন জাতানি জীবন্তি"—বলিয়া ভৃগুবারুণি-সংবাদে এই "জগতাং ধাত্রী"কেই ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর এই তত্ত্ব-বস্তু স্বকীয় শক্তির দ্বারাই ত সৃষ্টি-প্রসব, রক্ষা ও প্রত্যাহার বা সংহার করিয়া থাকেন। শক্তি ও শক্তিমান্, গুণ ও গুণী একই সত্তা ও একই সত্য, দুই নহে; ইহা স্বীকার করিলেও, গুণকে এবং শক্তিকে আমরা গুণী ও শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ করিয়াও কল্পনা করিয়া থাকি। এরূপ কল্পনার দ্বারা শক্তিকে আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারি, শক্তিমান্‌কেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। এই-জন্য ধ্যানের ভূমিতে, রসের রাজ্যে, আমরা সর্ব্বদাই গুণীকে গুণ-ভূষিত, ও শক্তিমান্‌কে শক্তি-পরিবেষ্টিত বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এই দুর্গা-ধ্যান এই মামুলী ভাবনাকেই ব্যক্ত করিতেছে। 'অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ'র দ্বারা এখানে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ যোগশক্তি বা যোগসিদ্ধিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই সকল যোগশক্তি ভগবদৈশ্বর্য্যের মধ্যে পরিগণিত। এই অষ্টশক্তি আছে বলিয়াই পরম তত্ত্ব একই সঙ্গে "অণোরণীয়ান্" এবং "মহতো মহীয়ান্"—অণু হইতেও অণু এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ। এইজন্যই ত তিনি—"আসীনো দূরং ব্রজতি"—উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন; "শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র"—শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। এই শক্তি-প্রভাবেই ত তিনি "সর্ব্বস্য ঈশানম্"—সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের প্রভু। অতএব যাঁরা উপনিষদের

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁরাও এই "জগতাং ধাত্রী"র ধ্যান করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের নিরাকার-সিদ্ধান্ত নষ্ট হয় না। আর এই যে জগতাং ধাত্রী, তাঁর রস-মূর্ত্তিই ত দুর্গা-প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্গার প্রতিমা দেখিবামাত্র তাহাতে নারী-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ যে নারী, ইহা ধ্যান-যোগে ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের মধ্যে আনিতে হয় না। নবপত্রিকায় নারী-বুদ্ধি ধ্যানযোগে আনিতে হয়, কিন্তু প্রতিমা-প্রত্যক্ষমাত্র এ জ্ঞান জাগিয়া উঠে। দুর্গা-মূর্ত্তি যে প্রত্যক্ষ নারী-মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি যে প্রত্যক্ষ মাতৃমূর্ত্তি। দশভূজা হইলেও, এ ছবি মায়ের, আর কাঁহারও নহে। নারী-রূপ মাতৃরূপ। বিশ্ব-মাতৃরূপও নারী-রূপ। আমাদের নিজের মাকে দিয়াই ত আমরা বিশ্ব-মাতা' বা বিশ্বজননী বা জগতাং ধাত্রীকে জানিতে ও ধরিতে পারি। আর এই দুর্গা-প্রতিমাতে মায়ের সকল লক্ষণ ফুটিয়াছে। কুমার যে দুর্গার মূর্ত্তি গড়ে, তাহাতে দুর্গার ধ্যান-মূর্ত্তিটিকেই সে ফুটাইয়া তোলে। আর এই ধ্যানে যে-দেহ কল্পিত হইয়াছে তাহা মাতৃ-দেহ, পরিপূর্ণ, নিত্যশক্তিশালী মাতৃ-দেহ।

জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্।
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশ-বাহু-সমন্বিতাম্ ॥

এ ত মাতৃরূপ। জটাজূটসমাযুক্তা মা আমার সন্ন্যাসিনী নহেন, কিন্তু স্নেহ-আকুলা, অক্লান্ত-সেবা-পরায়ণা। ঐ জটাজূট পৃষ্ঠে আলুথালু হইয়া পড়ে নাই, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখর, মাতার চূড়ায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে জড়িত—এ যে আমার মা। রন্ধনশালে প্রতিদিন প্রভাতে বাঙ্গালী যে ঐ মার রূপ দেখিয়াছে। আমার মা যে ত্রিনয়নী—সন্তানের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ভাবনায় সর্ব্বজ্ঞা ও সর্ব্বদর্শিনী। মার মুখ যে বড় মিষ্ট, অমৃতের আধার—অমন স্নিগ্ধ-সুন্দর মুখ জগতে আর কোথায়? আর মা পীনোন্নতপয়োধরা, ইহাই ত মাতৃত্বের প্রস্ফুট রূপ, নিত্যসিদ্ধ লক্ষণ। আমাকে স্তনদান করিতে করিতে সুখাবেশে যখন তাঁর ওষ্ঠদ্বয় ভিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাঁর কুন্দনিন্দিত দন্তগুলিতে কি রূপই না ফোটে! আর তাঁর বাহু যে আমার অঙ্গে মৃণালবৎ সংস্পর্শ দান করে, তারই কি আবার কথা? দুর্গা-প্রতিমাতে এই ধ্যান-মূর্ত্তিটিই ফুটিয়াছে। এই মূর্ত্তি মাতৃমূর্ত্তি। দুর্গাকে দেখিয়া মাতৃভাব আপনি জাগিয়া উঠে।

এইজন্যই এ প্রতিমাকে প্রতীক বলিতে পারি না। ইহা সম্পদ্ ও নহে। ইহা রূপক। বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা নিম্ন-অধিকারীর প্রতীকোপাসনা নহে, মধ্যম অধিকারীর সম্পদুপাসনাও নহে, ইহা ভক্তের রূপকোপাসনা। ভাবুকের আপনার ইষ্টদেবতার রস-মূর্ত্তির পূজা।

আর এইজন্যই এই মহাপূজার সময়ে প্রাণটা অমন করিয়া উঠে। চারিদিকে যখন পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখন সমগ্র সাধক-সমাজের সঙ্গে এক হইয়া, হাত তুলিয়া, উর্দ্ধনেত্রে,—মা! মা! বলিয়া চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয়।

—নারায়ণ, ১৩২২

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রুতি বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। অনুভূতি-গ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস; হৃদ্‌গত আসক্তির দ্বারা যাহা অনুভবযোগ্য হয়, তাহাই রস। ভগবান্ রসস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি মানুষের অনুভূতিগম্য, আসক্তি-গ্রাহ্য। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, রস চতুঃষষ্টি রকমের আছে, এবং মানুষের হৃদয়ে একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে। স্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহ অতি প্রবল। এই মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহের সমবায়ে ভগবানের জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী-রূপের উপকল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় যে, ভগবান্ ভাবের ঠাকুর, অর্থাৎ তিনি ভাব-গ্রাহ্য। সেই ভাব-জন্য তিনি কখনও-বা বনমালী শ্যামনটবর, কখনও-বা মুণ্ডমালাধারিণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা। তিনি যাহা, তাহা আছেনই; চিরদিনই থাকিবেন। তবে সাধকের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি মনোময় রাজ্যে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সাধক যে-ভাব অবলম্বনে সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভাবঘন-অবস্থায় ইষ্টদেবতা ভাবানুকূল-রূপে সাধকের হৃদয়-মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠেন। ইহা ধ্যানগম্য ও জপসিদ্ধ রূপ। সাধক পরে এই রূপ লোক-সমাজে প্রচারিত করিয়াছেন; মৃন্ময়রূপ গড়িয়া তাহার পূজা করেন। এই পদ্ধতি-অনুসারে বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজার প্রচলন।

ভারতের কোন প্রদেশে বাঙ্গলার পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হয় না। তবে নবরাত্রের উৎসব ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। প্রতিপদ্ হইতে নবমী

পর্য্যন্ত এই নয় দিনের নয়টা নিশায় মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। এ পূজায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-পাঠ ও মহালক্ষ্মীর যন্ত্রে মহাবীজের সাহায্যে মাতৃশক্তির আবাহন হইয়া থাকে। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। কি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে, কি তন্ত্রের জপ-তপে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত ছিল না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যজ্ঞ ও হোমে পরিসমাপ্ত হইত; তন্ত্রোক্ত কর্ম্মে যন্ত্র-পূজা ও হোম হইত। ভারতের প্রায় সকল তীর্থ স্থানে যত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সকলেরই গোড়ায় একটি করিয়া সিদ্ধ যন্ত্র আছেই। বৌদ্ধ প্রভাবের পরই এদেশে মূর্ত্তি-পূজার প্রচলন হয়। বৌদ্ধতন্ত্রে মূর্ত্তি-পূজার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য অতি প্রবল ছিল বলিয়া, অনেকে অনুমান করেন যে, বাঙ্গলা দেশেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া দেবপূজার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের অন্য সকল প্রদেশে এই পদ্ধতি এমন সাধারণভাবে প্রচলিত নাই। বাস্তব পক্ষে পুরাতন সকল তন্ত্র আলোড়ন করিলে দেখা যায় যে, তন্ত্র মূর্ত্তি-পূজার জন্য তত ব্যস্ত নহে, যত ভাবারাধনা, হোম ও জপের জন্য ব্যস্ত। যাহা হউক, এই যন্ত্রোদ্ভূত ভাবকে শরীরী করিয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা এ দেশে হইয়াছে, বলিতে হইবে। দুর্গার মূর্ত্তি ভাবময়ী মূর্ত্তি, দুর্গার পূজাও ভাবের পূজা।

এখন বুঝিতে হইবে, ভাব কি, জপই বা কেমন, মন্ত্রের শক্তিই বা কতটুকু। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতা, উদ্বোধিত দেবতা—যে কোনও দেবতার নিত্য বা নৈমিত্তিক হিসাবে পূজা হইয়া থাকে—সকল দেবতাই গৃহস্থের জাতি, বর্ণ, গোত্র, প্রবর সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে আত্মজের তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তোমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইলেই, তোমার বাটীর দুর্গা তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর সকলই গ্রহণ করিবেন। তোমার অশৌচ হইলে দেবতার অশৌচ হইবে। তাই ব্রাহ্মণে কায়স্থের বা শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা খৃষ্টানী ধর্ম্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিয়াছি; ইংরেজি-শিক্ষিত আমাদিগের অনেকের মনে এই ধারণা হইয়া আছে যে, ভগবান্ আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঘটে পটে আনিতে হয়। সে দেবতা ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই দেবতা। তাই কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম না করিলে ইংরেজি-নবীশ মহাশয়গণ ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা-তামাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেবারাধনার ইহা মূল তত্ত্ব নহে। আমাদের দেবী ভবানী জগন্ময়ী—জগদম্বিকা, আব্রহ্মতৃণস্তম্ব-পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বস্বে ও সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে, দুগ্ধে নবনীতের তুল্য নিত্য-বিরাজিত। আমি জীব, আমিও যাহা, তিনি শিব, তিনিও তাহাই। তবে জীব আমি, অহঙ্কারাদি অবিদ্যা-

ঘোরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জলে থাকিলেও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানে সদা প্রমত্ত। এই অহং-মমেতি ভাবের জন্য জীব শিব হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই পার্থক্য বা স্বতন্ত্র ভাব-জন্য জীবের মনে চ্যুতির বা বিরহের ভাব পরিস্ফুট হয়। যে বিরহ-কাতর নহে, তাহার ভাগ্যে ভগবৎ-আরাধনা ঘটে না। জন্মে জন্মে নানা আঘাত খাইতে খাইতে তবে এই চ্যুতি-জন্য কাতরতার ভাব মনে মনে জাগিয়া উঠে। এই বিরহের ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই আরাধনা ও উপাসনার প্রবর্ত্তনা;—জীব-শিবে সমন্বয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা। এই সাধনা প্রবৃত্তিমূলা ও নিবৃত্তিমূলা। সাধনার তিনটী অঙ্গ আছে:—প্রথম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ভক্তিযোগ, তৃতীয় জ্ঞানযোগ। বিষয়ী গৃহস্থের পক্ষে—নিম্নাধিকারীর পক্ষে, প্রবৃত্তিমূলা সকাম সাধনাই প্রশস্ত। নিবৃত্তির আবার সন্ন্যাস-সংযম, সর্ব্বত্যাগে ও বৈরাগ্যে বিন্যস্ত। প্রবৃত্তির আবার সর্ব্বস্ব ইষ্টে বা শ্রীকৃষ্ণেসমর্পণে বিন্যস্ত। নিবৃত্তিমার্গে ভোগ নাই; প্রবৃত্তিমার্গে ভোগ আছে বটে, কিন্তু নিজের সামগ্রী বলিয়া, নিজের উপার্জিত বিত্ত বলিয়া উপভোগ নহে। আমার যাহা কিছু, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের। পুত্র, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, গৃহস্থালী, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই, আমি তাঁহার দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রতিপাল্য,—আমি তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিয়া, তাঁহার কর্ম্মচারীর ন্যায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের মূলে এই সর্ব্ব-সমর্পণের ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে।

আরও একটু রহস্য আছে। তিনি রসময়—ভাবময়—গুণময়। আমি তাঁহার ভাব-সাগরের বুদ্‌বুদ্‌মাত্র। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহাতে মিশিতে হইলে, আমার হৃদ্‌গত রসের বা আসক্তির একটি ধারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, তদ্ভাবভাবুক হইয়া তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তবে আমার জীবন্মুক্তি ঘটিবে। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন—

"এবার শ্যামা তোমায় খাব;
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দু'টোর একটা করে যাব।"

অর্থাৎ, হয় আমি মাতৃভাবে ডুবিয়া মা-ময় হইয়া যাইব, নয় মা আমাকে তাঁহাতে মিলাইয়া লইবেন। ভক্তি-সূত্রকার বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরতুষ্টেঃ একো'পি বলী"—ঈশ্বর-তুষ্টির জন্য একটা আসক্তিকে প্রবলভাবে ধরিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখোপপত্তির উদ্দেশ্যেই সাধনা। অহঙ্কার-জন্যই দুঃখ। কেন না, আমার আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলেই পদে পদে বাধা পাইতে হয়। "বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।" বাধাই

দুঃখ। অতএব বাধা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ দূর হয়। বাধা যখন আমিত্বে, তখন এই আমিত্বের নাশ করিতে পারিলেই সুখ। রসময়, ভাবময়, আনন্দময় শিবে আমিত্বকে ডুবাইতে হইবে। আসক্তিকে ধরিয়া এই নিরঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। আমার আসক্তি, আমার আত্মজ। আসক্তি-জন্যই ইষ্টের রূপ ও আবির্ভাব। তাই আমার ইষ্ট আমার আত্মজ, আমার গোত্রপ্রবরধারী। তিনি আমার ভাবের সন্তান—রসের বিতান। তাঁহাকে পিতা বলি, গুরু বলি, সখা বলি, মাতা বলি, পুত্র বলি—এ সকল সম্বন্ধই ত আমার ভাবজ। আমি ডাকি বলিয়াই ত তিনি আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, গুরু, কর্ত্তা, প্রভু, পরিত্রাতা। ইহ সংসারে আমি যাঁহাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বলিয়া ডাকি, তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-জাতি-বর্ণ ধারী, তেমনই আমার দেবতা আমার সম্বন্ধে ভাব-সংবদ্ধ হইলে, তিনি আমারই হইয়া থাকেন, আমার ভাবের সন্তান বলিয়া পরিচিত হন। বিগ্রহ-পূজার গোড়ায় এই মাধুরীটুকু আছে। আমরা এ মাধুরীর আস্বাদ গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি বলিয়া বাঙ্গালার দেবতার পূজায় আর তেমন ভাবের ফোয়ারা ছুটে না।

দুর্গোৎসবে মা কন্যা-রূপে বাঙ্গালীর গৃহে আসিয়া থাকেন। ভক্তের মা-ই সর্ব্বস্ব, মাকে লইয়াই তাহার ঘর, গৃহস্থালী। কন্যারূপিণী জগন্মাতার তাই শ্বশুরবাড়ী আছে, স্বামী আছেন, বৎসরে বৎসরে এই সময়ে তাঁহাকে বাপের বাড়ীতে আসিতে হয়। মায়ের আমার সাংসারিক সুখ-দুঃখ আছে, অভাব-অভিযোগ আছে, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে; তাই তিনি জ্বালা জুড়াইতে বাপের বাড়ী আসেন। কাজেই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন,—

"এবার আমার উমা এলে,
আর আমি পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনবো না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে—
উমা আমার থাকে দুখে,
শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি এসেন মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়,
তবে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মান্‌বো না॥"

এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা বাঙ্গালী ভক্ত ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না। জগদম্বা কন্যা ;—যখন কন্যা, তখন ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া তাঁহাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে। আমার পুঁটী, বুড়ী যেমন আমার মেয়ে ; উমা, গৌরী, পার্ব্বতীও আমার তেমনই মেয়ে। যখন ভাব ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তখন ঠিক ভাবের মত রূপই তাঁহাকে ধরিতে হইবে। ভাবের পূজার মহিমাই এইটুকু।

ভগবান্‌কে ভাবময়-রূপে পূজা করিতে হইলে, সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। এইটুকু জপে বুঝা যায়। যে ভাবের যে বীজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ কর না, সেই জপের ফলে প্রথমে বিভীষিকা, পরে প্রলোভন, শেষে সামীপ্য ঘটিবেই ঘটিবে। শব-সাধনার আদিতে যে বিভীষিকা দেখা যায়, সে সকলই মানস, প্রাকৃত নহে। ইংরেজিতে তাহাকে hallucination বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ডাকিনী, যোগিনী, প্রমথগণের দ্বারা নানা বিভীষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তিও এমনই বিভীষিকা দেখে। বিভীষিকা সামলাইতে পারিলে, পরে প্রলোভনের উদ্ভব হয় ; অপ্সরী-কিন্নরী কত আসে, কত নাচে, স্তূপে স্তূপে কত মণি-মুক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কত ধন-দৌলত পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে। ভয় ও ত্রাসের উপর বিভীষিকার প্রভাব, কাম ও লোভের উপর প্রলোভনের বিস্তার। এ সকল কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, তবে ঐশ্বর্য্যানুভূতি ঘটে। কি জানি কেন, কোন্ শক্তির প্রভাবে ঘটে, তাহা জানি না ; কিন্তু শেষে দেখিতে পাই, হেতি-পেতি যন্ত্রমন্ত্রধারিণী, সর্ব্ব-শক্তিময়ী সর্ব্বভাবময়ী, বরাভয়দায়িনী জগন্ময়ী অপূর্ব্ব-রূপে হৃদয়-আকাশে স্থির-দামিনীর ন্যায় কোটি সূর্য্যের দ্যুতিতে ফুটিয়া উঠেন। যে যথারীতি জপ করিতে পারিয়াছে, জপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার ভাগ্যেই এমন অপূর্ব্ব দর্শন ঘটে। এই ঐশ্বর্য্য-দর্শন হইতেই দুর্গোৎসবের দশভুজার পূজা এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ সর্ব্বপ্রথমে এই রূপ দর্শন করেন। তাঁহার শিষ্য বিরূপাক্ষ এ সমাচার পান। বিরূপাক্ষের শিষ্য সদানন্দ স্বামী সর্ব্বপ্রথমে দুর্গোৎসব করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়েও বাঙ্গালায় কালীপূজা প্রবল ছিল, নবরাত্রের মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে ও যন্ত্রেই হইত। সদানন্দের পদানুসরণ করিয়া আগমবাগীশই এই দশভুজার পূজার প্রবর্ত্তন করেন।

তন্ত্র ভাবের অক্ষয় খনি। দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। চালচিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবপত্রিকা পর্য্যন্ত দশভুজা-মূর্ত্তির সর্ব্বত্র ভাবের দ্যোতনা আছে। সে ভাব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাব। আব্রহ্ম-

তৃণস্তম্ব-পর্য্যন্ত যে মা জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিতে যে মা হ্রী, শ্রী, ধী, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি, কান্তি, তৃষাতৃষ্ণা, নিদ্রা-মায়া-রূপে বিরাজমানা, সেই মায়ের অভিব্যক্তনা দশভুজা। দুর্গোৎসব ভাবের অশ্বমেধ, রসের রাজসূয়। দুর্গোৎসবে মা মহালক্ষ্মী, মহামেধা, মহাঘোরা, মহামায়া। তুমি এ ভাবের ভাবুক হইলে, তবে ত ইঙ্গিতে বুঝাইতে পারি, এ মা কেমন—এ মা কিসের? কিন্তু যাহা মূকাস্বাদবৎ, যে বুঝিয়াছে, সেই মজিয়াছে; তাহা ত ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। একটা কথা বলিয়া রাখি। তন্ত্রে বা কর্ম্মপ্রধান শাস্ত্রে খোস্-খেয়ালের কথা নাই। কর্ম্ম আছে, কর্ম্মের ফলশ্রুতি আছে। কর্ম্ম কর, ফল পাইবেই। যদি যথারীতি কর্ম্ম করিয়া সদ্গুরুর আশ্রয়ে সাধনা করিয়া ফল না পাও, তবে জানিও, সে কর্ম্ম মিথ্যা, সে গুরু জুয়াচোর। তাই তন্ত্রের ধর্ম্ম বুঝাইবার নহে, করিবার ধর্ম্ম—কর্ম্মীর ধর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিয়া ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মজিয়া গিয়াছে—পাগল হইয়া গিয়াছে। তাই দশ-ভুজার পূজারও কিছু ব্যাখ্যা করিবার নাই; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগাগোড়া তন্ত্র-তত্ত্ব বুঝাইতে হয়। যাহা বুঝান যায় না, তাহা করিয়া-কম্মিয়া দেখাইয়া দিতে হয়। বাঙ্গালায় কর্ম্মী লোপ পাইয়াছে, তাই কর্ম্মও লোপ পাইতেছে। কর্ম্মভ্রষ্ট অনেক ভণ্ড বাঙ্গালার কর্ম্ম পণ্ড করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী ইষ্টদেবতাকে লইয়া একটি অপূর্ব্ব ভাবের হাট-বাজার বসাইয়াছিল। কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক, সবাই সংসারটাকে ইষ্টের সংসারে পরিণত করিয়াছিল। অহঙ্কারকে ভক্তির দৈন্যে এমনই আধিয়া-চুবিয়া মনোময় করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সংসার-দাব-দাহের জ্বালা বারো আনা কমিয়া গিয়াছিল। এক দিকে রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্ত তান্ত্রিকগণ "আমি তুয়া দাস—দাসদাসী পুত্র হই" বলিয়া মা-ময় হইয়া থাকিতেন, অন্য দিকে বৈষ্ণবভক্তগণ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া মধুর রসের অপূর্ব্ব মদিরা-ধারা-পানে নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঙ্গ-রস, ছড়া-কাব্য, গান—সকলই কালী, কৃষ্ণ, শিবকে লইয়া চলিত। তখন বিদ্যাসুন্দরেও মা কালীকে আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। অচ্যুত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, উভয়েই কালী ও কৃষ্ণ লইয়া পরিহাস-উপহাস করিতেন। সবাই যেন ভাবে উদ্দাম করিতেন, ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

বাঙ্গালী ভক্ত ও কবি কখনও এই ভাবের খেলায় তত্ত্ব-হারা হন নাই। তাই দাশরথি রায় গান করিয়াছেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।"

তত্ত্ব-জ্ঞানটা কবির মনে টনটনে রহিয়াছে। তিনি মৃন্ময়ী রূপশালিনী দেবীকে চিন্ময়ী অরূপিণী বলিয়া বেশ জানিতেন। তাই আর একজন ভক্ত গান করিয়াছেন,—

"জাননারে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখনও কখনও পুরুষ হয়।"

এই একটী ক্ষুদ্র গীতে দর্শন-শাস্ত্রের, উপনিষদ্-শাস্ত্রের, উপনিষদ্-রাশির একটা মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মা যে মনোময়ী, ভাবময়ী, এ-কথা বাঙ্গালী-মাত্রেই জানিতেন ; তাই ভাবুক কবি গাহিয়াছেন, "তুমি দেখ, আর আমি দেখি, মন, আর যেন কেউ নাহি দেখে।" এই দেশব্যাপী ভাবমাধুর্য্য এখন আর নাই বলিলেও চলে। ধর্ম্ম-ময়, ভাব-ময় জীবন ছিল আমাদের ; রসপূর্ণ, ভক্তিপূর্ণ সমাজ ছিল আমাদের। আমরা আপনহারা হইয়া ইষ্টের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। তাই বাঙ্গালা মর্ত্ত্যের স্বর্গ ছিল—সুখময় স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের মহত্ত্ব এখনও বাঙ্গালী বুঝিতে পারিলে জীবনের অনেক দুঃখের উপশান্তি ঘটে।

—সাহিত্য, ১৩১৮

বিজয়া

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আজ বিজয়া। প্রতিমা দালান হইতে উঠানে নামিয়াছেন। আজ আর পুরোহিত নাই ; বাজে লোক নাই ; শুদ্ধ বাড়ীর মেয়েছেলে ও নিতান্ত আত্মীয়স্বজনের মেয়েছেলে। পুরুষেরা উঠান ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গিন্নী নূতন কাপড় পরিয়া বরণডালা মাথায়, উপস্থিত হইলেন ; সঙ্গে মেয়ে, বৌ, বাড়ীর আর আর মেয়েছেলে। সকলে আসিয়া মাকে নমস্কার করিলেন। অধিবাসের যত জিনিস ছিল, গিন্নী সকলগুলিই এক এক করিয়া মা-এর মাথায় ছোঁয়াইয়া বরণডালায় রাখিতেছেন ; এক-একবার ছোঁয়াইতেছেন আর তাঁহার

চোখ ফাটিয়া জল পড়িতেছে। ক্রমে সব মেয়েদেরই চোখে জল আসিল। পুরুষেরাও আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। অন্য সময় এ দুর্ব্বলতাটুকু যাঁহারা দেখাইতে চান না, এখন তাঁহাদের সে ভাব রহিল না। কারণ, এ শোকে লজ্জা নাই। বরণ আরম্ভ হইল। বিশ-ত্রিশ জন স্ত্রীলোক মহামায়াকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, একবার, দুইবার, তিনবার, ক্রমে সাতবার প্রদক্ষিণ হইল। তাহার পর সকলে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন। পরে কর্ত্তা এক পূর্ণপাত্র আনিয়া প্রতিমার সম্মুখ হইতে—গৃহিণী প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার অঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন। গৃহিণী এই 'কনকাঞ্জলি' লইয়া সংবৎসর মায়ের শোক নিবারণ করিবেন।

এই সব ত হইয়া গেল। তাহার পর কিছু মিষ্টান্ন আসিল। গৃহিণী একটি মিষ্টান্ন লইয়া মায়ের মুখে দিলেন আর একটি মায়ের হাতে দিলেন। এইরূপে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়ান হইল ও পথের সম্বলস্বরূপ কিছু হাতেও দেওয়া হইল। ইহার পর বিসর্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

এই দুর্গোৎসবের ব্যাপারটা কি? হৈমবতী বিবাহের পর মহাদেবের সঙ্গে কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। মেনকা ক্রমাগত গিরিরাজকে মেয়ে আনিবার জন্য জিদ্ করিতেছেন। শেষে, গিরিরাজ কৈলাসে লোক পাঠাইলেন, অনেক কষ্টে মহাদেব পার্ব্বতীকে তিন দিনের জন্য ছাড়িয়া দিবেন, স্বীকার করিলেন। যে তিন দিন হৈমবতী গিরিরাজের বাড়ীতে ছিলেন, সেই তিন দিন গিরিরাজ-পুরে মহামহোৎসব হইল। তাহার পর দশমীর দিন হৈমবতী পুনরায় কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। এখন বুঝিলেন, দুর্গোৎসবের ব্যাপারটি মেয়ে আনা ও মেয়ে-বিদায়ের ব্যাপার। কর্ত্তা স্বয়ং গিরিরাজ, গৃহিণী স্বয়ং মেনকা, আর মহামায়া তাঁহাদের কন্যা। মেয়ে-বিদায়ের ব্যাপার যে দেখিয়াছে, যে ভুগিয়াছে, সেই 'বিজয়া'র অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। ভক্তরা বলেন, বিজয়ার সময় মহামায়ারও চোখের কোণে জল দেখা যায়। ভালবাসা ত শুধু বাপ-মায়ের নয়, মেয়েরও ত ভালবাসা আছে। যখন বাড়ীশুদ্ধ সকলেই কাঁদিয়া আকুল, মহামায়া কি তা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়।

নদীতে হউক, পুষ্করিণীতে হউক, হ্রদে হউক, বিলে হউক, মা-এর বিসর্জন হইয়া গেল। জগৎকারণ যে মাটি, সেই মাটি হইতেই মহামায়ার মূর্ত্তি গড়া হইয়াছিল, মাটিরই সাজ-সজ্জায় তাঁহাকে সাজান হইয়াছিল। যিনিই মাটি

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই মাটির মূর্ত্তিতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাকে সজীব করিয়াছিলেন, তাহাকে 'পরা শক্তি' করিয়াছিলেন, তাহাকে সকলের চেয়ে বড় করিয়াছিলেন—এখন তিনি আর নাই—যে মাটি সে আবার মাটিই হইয়া গেল, জলে মিশিয়া গেল। যত লোক দেখিতে আসিয়াছিল, এ ব্যাপার সকলেই স্বচক্ষে দেখিল। শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে আপন আপন ঘরে ফিরিল। যাহার দালানে দুর্গা আসিয়াছিলেন, তাহার কথা ত দূরে যাউক, দেশশুদ্ধ লোক দেখিতে লাগিল—সব শূন্য! সবাই শূন্য মনে বাড়ী ফিরিল! তাহারা এতক্ষণ যে এক অমানুষ শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল, সে শক্তির আজ অন্তর্ধান হইয়াছে; তাই তাহাদের আবার আত্মীয়স্বজন মনে পড়িয়াছে—মনে পড়িয়াছে এ শক্তি ক্ষণকাল আমাদের নিকটে আসিলেও আমরা এ শক্তি হইতে ভিন্ন, এ শক্তির অনেক নীচে, এখন আমাদের যাহা আছে, যাহা লইয়া আমাদের ঘর করিতে হইবে, যাহা লইয়া আমাদের চিরদিন থাকিতে হইবে, তাহাদের সম্মান, সম্ভাষণ, পূজা করাই আমাদের আবশ্যক। তাই ছেলে আসিয়া বাপের পায়ে গড়াইয়া পড়িল, বাপ তাঁকে কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাহার মস্তকের ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বড় ভাই তাঁহাকে কোল দিলেন। যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, সকলেই পরস্পর সম্মান ও সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। যিনি সকল সম্পর্কের অতীত, তিনি যতদিন উপস্থিত ছিলেন, ততদিন এ সকল পার্থিব সম্পর্ক তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন আবার সে সম্পর্ক জাগিয়া নূতন হইয়া উঠিল। গৃহিণী শূন্য দালানে আসিয়া সব শূন্যময় দেখিলেন, তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন, কাঁদিয়া ত আকুল। কর্ত্তারও অবস্থা তাই। তবে তিনি পুরুষ। তিনি গৃহিণীকে প্রবোধ দিলেন, বলিলেন, "ভয় কি? মা আবার এক বৎসর পরে আসিবেন।" সেই আশায় বুক বাঁধিয়া, সকলে আবার সংসার-ধর্ম্মে মন দিল।

—নারায়ণ

কোজাগর লক্ষ্মীপূজা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

এস মা বরদে—এস, আজ শারদীয় পূর্ণিমায় তোমায় বরণ করি। আজ কোজাগর। পুরাণে লিখিত আছে—

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্তীতি ভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥

আজ মা নিশীথে ভক্তের গৃহে আসিয়া বলিবেন—কে জাগিয়া আছ—কে পাশা খেলিতেছ—তাহাকেই আমি বরদান করিব।

সংসারটা ঠিক পাশাখেলা। এই ঘুঁটি পাকে-পাকে আর অমনি মারা যায়। আর এক চাল, তাহা হইলেই জিৎ—ওমা, কোথা থেকে আমার টক্‌টকে পাকা ঘুঁটিটি গাদে পড়িল, আর খেলা কাঁচিয়া গেল। একেবারে মুখে কালি-চুণ। আবার ওদিকে কখন বা কেবল পোহাবারো আর আঠারো—দেখিতে না দেখিতে বাজিমাৎ।

সংসারে কেবল জিৎ হয় না—হার-জিৎ আছেই আছে। আবার বাড়া ভাতে ছাইও পড়ে। চঞ্চল আশা—সুখ-দুঃখের বাসা—সংসারটা যেন পাশার তামাসা।

মা কমলা বড়ই চঞ্চলা। এই পোয়া এই কচ—এই পূর্ণ এই শূন্য, এই পাকা এই কাঁচা, এই উঠ্‌তি এই পড়্‌তি। মায়ের এই চঞ্চলতার হেঁচকা টানে যে কাতর হয় না, তাহাকেই মা লক্ষ্মী অক্ষয় বর প্রদান করেন। যে সম্পদে-বিপদে, আশায়-নিরাশায় পুরুষকার ছাড়িয়া দেয় না—যে শোক-মোহের নিশীথেও জাগ্রত থাকে—অবসন্ন হয় না—সেই লক্ষ্মীর বরপুত্র। পুরুষ-সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।

পুরাণে আরও লেখা আছে—

নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ পিতৄন্ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
বন্ধুংশ্চ প্রীণয়েত্তেন স্বয়ং তদশনো ভবেৎ॥

কোজাগর পূর্ণিমায় নারিকেল ও চিড়ার দ্বারা পিতৃপুরুষ ও দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে, বন্ধুবান্ধবকে তৃপ্ত করিবে ও স্বয়ং উহা ভোজন করিবে।

ইহার কারণ কি? শাস্ত্র-কথা ছাড়িয়া সহজ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

অন্ন লক্ষ্মী। যদি চঞ্চলাকে স্থির করিয়া রাখিতে চাও ত অন্নের যে রূপটি অধিক দিন স্থায়ী তাহারই ভজনা কর। চিপিটকের (চিড়া) মত অন্নের স্থায়ী পরিণাম আর কি আছে। দূরগামী যাত্রীর চিড়াই প্রধান সম্বল। তাই কোজাগর পূর্ণিমায় অন্নের অন্য সব পাক ছাড়িয়া চিড়ার চলন। ফল—মানুষের ভাগ্যের নিদর্শন। আর যে সুমিষ্ট সুরসাল ফলের সার শ্বেতবর্ণ, তাহা ত মূর্ত্তিমান্ সৌভাগ্য। নারিকেলের মত অটুট ও স্থায়ী ফল ত দেখা যায় না। উহা আবার সহজে কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। আর কোনও ফল নারিকেলের মত অতদিন রাখা যায় না। সেইজন্যই কোজাগর রাত্রিতে নারিকেলের ব্যবহার।

যদি চঞ্চলাকে স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় বাঁধিয়া রাখিতে চাও, তাহা হইলে শারদীয়া পূর্ণিমায় মা লক্ষ্মীর পূজা করিও—পাশা খেলিয়া রাত্রি জাগরণ করিও—সংসারের সুখ-দুঃখের খেলায় সজাগ থাকিও—অবসন্ন হইও না। আর যাহাতে অন্নের সংস্থান সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় অটুট হয়, তাহার জন্য নারিকেল চিড়া খাইয়া মা লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিও।

—সন্ধ্যা

আকাশ-প্রদীপ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ-সূত্রকে যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা মূঢ় ;—পারম্পর্য্য হারাইয়া অচিরে তাহাদের বিনাশ ঘটে। অতীতকে ভুলিতে নাই, ভুলিলে অনাগতের ক্রম-বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে। যাহাদের বিগতের সহিত যোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—অথবা তাহা নাই, তাহারা সঙ্কর জাতি। বর্ত্তমানের অভ্যুদয় তাহাদের কাছে অসম্ভব, ভবিষ্যতের আশা তাহাদের নিকট নিরর্থক।

ভারতের আর্য্যজাতি এই তত্ত্ব বুঝিতেন বলিয়া তাঁহাদের সমাজ-ধর্ম্মে আকাশ-প্রদীপ-দানের ব্যবস্থা আছে। স্বর্গের দিকে মর্ত্ত্যের প্রদীপকে জ্বালিয়া দিতে হয়। পিতৃলোক সে আলোক দেখিতে পান—দেখিয়া আশান্বিত হন—মর্ত্ত্যভূমির সন্তানদের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন।

ফেরঙ্গ-সভ্যতার বিকৃত প্রভাবে আমরা এই সব ভুলিতে বসিয়াছি ; কেবল ভুলি নাই, অশ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি! অনেকে তাই আলোক নিভাইয়া ফেলিয়াছে। হায় রে, আসুরী মোহ!

আমি কে? আমি ত আকস্মিক কিছু নই, আমি যে একটী অনন্ত-প্রবাহী প্রবাহ-ধারার বীচি-বিক্ষোভ মাত্র। ঐ ধারার পারম্পর্য্যের সহিত অঙ্গাঙ্গী হইয়াই আমার পরিচয় ; উহা হইতে ব্যবচ্ছিন্ন হইলে আমি মরু-প্রান্তরে শুকাইয়া যাই! অনন্তের দিকে আমার যে গতি ছিল—তাহা চিরন্তন স্তব্ধ হইয়া যায়।

এই কথাটী ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের পিছনে একটী মহিমময় অতীত রহিয়াছে—তাহার ধারা আমাদের মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে, উহা আবার সেই বিগত বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করিবে। কেবল ধারাটী বজায় রাখা চাই।

অবিশ্বাসী হইও না। তুমি যাহা পার না—পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া যায়। এ অঘটন ঘটে—ঘটিবেও। কেবল সন্ধ্যা আসিতে আসিতে হিমের অসাড়তার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রদীপটী জ্বালিয়া পিতৃলোকের দিকে তুলিয়া ধরিও, আশা পূর্ণ হইবে—ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

—সন্ধ্যা

শ্রীশ্রীকালীপূজা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালায় মৃন্ময়ী প্রতিমা-পূজা প্রচলনের পর হইতে, পটুয়াদিগের প্রভাব-বৃদ্ধির পর হইতে, বাঙ্গালীর বর্ণ-পরিচয় লোপ পাইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের কালের পর হইতে, শ্রীচৈতন্য-সেবকগণের অভ্যুদয়ের সময় হইতে বাঙ্গালায় মাটির প্রতিমা গড়িয়া পূজার প্রচলন বাড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহস্থের গৃহে তাম্রটাটের উপরে ইষ্টদেবীর যন্ত্র অঙ্কিত বা খোদিত থাকিত এবং সেই যন্ত্রের উপরে হোমাদি হইত, প্রতিমা-পূজা হইত না।

বাঙ্গালায় যে-সকল পুরাতন প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর মন্দির আছে, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকল দেব-প্রতিমার আসনের উপরে একটা করিয়া যন্ত্র অঙ্কিত আছেই। খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে বেদীর উপরে তান্ত্রিক যন্ত্র পাইবে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রত্নবেদীর উপরেও তান্ত্রিক যন্ত্র আছে। বাঙ্গালী পূর্ব্বে পূর্ণরূপে যান্ত্রিক ছিল—যন্ত্রোপাসনা করিত। বরেন্দ্রীর জগৎরাম রায় বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রথমে মাটির নির্ম্মিত সিংহবাহিনীর পূজা আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এই সংস্কার দৃঢ় ছিল যে, দশমহাবিদ্যার রূপ প্রকট করিয়া পূজা করিতে নাই। কালী দশমহাবিদ্যার আদ্যা-বিদ্যা, কালী-মূর্ত্তি গড়িয়া পূর্ব্বে কেহ পূজা করিত না। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালী-মূর্ত্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার সাধক-সমাজ অনেক দিন চলেন নাই ; লোকে 'আগমবাগীশী' কাণ্ড বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত। বিশেষতঃ স্বয়ং মূর্ত্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করা ত সহজ কথা নহে, তাই বাঙ্গালী উহার অনুসরণ করে নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের পর হইতে বাঙ্গালায় কালীপূজা সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়। মহারাজ ব্যবস্থা দেন যে, কুম্ভকারে কালী-মূর্ত্তি গড়িয়া দিলে এবং স্বয়ং অথবা শ্রীগুরুদেবকে প্রতিনিধি করিয়া কালীপূজা করিলে কালীপূজা করা হইবে। এখন সে ব্যবস্থাও উপেক্ষিত—এখন কুমারটুলি হইতে মাটির কালী-মূর্ত্তি আনাইয়া যে-কোন পুরোহিতের দ্বারা পূজা সম্পন্ন করান হয়। কিন্তু তন্ত্রের বিধান হইতেছে এই যে, কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি আদ্যা বা মহাবিদ্যার পূজা কেবল তাঁহারাই করিবেন, যাঁহারা ঐ সকল বিদ্যার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত। এ পূজা স্বয়ং করিতে হয়, নিজে অপারগ হইলে মন্ত্রদাতা গুরুকে প্রতিনিধি করিয়া পূজা করাইতে হয়। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল জাতির সাধকই পূজা করিবার অধিকারী। ভক্ত রামপ্রসাদ আগমবাগীশের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্বয়ং কালীপূজা করিতেন।

আজকালকার তথা-কথিত শিক্ষিত বাবু-সমাজ সাধনা-পূজা-সম্বন্ধে এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য খবর রাখেন না বলিয়া, অবান্তর হইলেও খবরগুলা দিয়া রাখিলাম। তোমরা পাদ্রীদিগের মুখে যে-জাতিভেদের পরিচয় শুনিতে পাও, যে-পৌত্তলিকতার সমাচার জানিতে পাও, তাহা পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কখনও ছিল না। বরং এখন বাবু-মহলে, ইংরেজের আইন-আদালত-গ্রাহ্য হিন্দু-আইনের প্রভাবে কতকটা সেই জাতি-বিচার ও পৌত্তলিকতা প্রচলিত হইয়াছে বটে ; পরন্তু এই উদ্ভট প্রচলনের মূলে বাবু-মহলের অজ্ঞতাই প্রবল হইয়া আছে। তোমরা দেব-দেবীর প্রণাম-পদ্ধতি ভুলিয়াছ, পূজা-প্রকরণের অর্থ বোধ

তোমাদের নাই, সে পুরাতন ভাষাবোধও নাই ; তাই ভ্রান্ত ধারণা-বশে তোমরা যা-তা করিয়া বস ! এজন্য শাস্ত্র অপরাধী নহে, সমাজও অপরাধী নহে। যাউক, এখন আসল কথাটা বলিব।

বর্ণ-পরিচয়

আমাদের আধুনিক বাঙ্গালীর বর্ণ-পরিচয় লোপ পাইয়াছে, ভাষা-জ্ঞান ক্ষীণ হইয়াছে। কালী-রূপের কোন বর্ণনায় তিনি মসীরূপিণী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তবে তাঁহার বর্ণ মসীময় হয় কেন ? উত্তরে বলিব— শ্যামা, শ্যাম-ঘোরা, ভীমা প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ আমরা ভুলিয়াছি। তন্ত্রে আছে—মা কালী—

কালাভ্র-শ্যামলাঙ্গীং বিগলিত-চিকুরাম্

অর্থাৎ কালরূপী মেঘের ন্যায় শ্যামলাঙ্গী কালী। কালের বা সময়ের মেঘই বা কেমন, তাহার বর্ণই বা কেমন ? ভক্ত কমলাকান্ত গান করিয়াছেন—

"নব সজল জলদকায়,
দেখিলে আঁখি জুড়ায়।"

নব সজল জলদের বর্ণ কি মসীবর্ণ ? ঘন-ঘোর মসীবর্ণ দর্শন করিলে ত নয়ন জুড়ায় না, উহাতে ত স্নিগ্ধতা নাই। অতএব বলিতেই হইবে, বাঙ্গালার পটুয়াগণ কালী-মূর্ত্তিকে যে বর্ণে রঞ্জিত করেন, মায়ের আমার সে বর্ণ নহে। ইংরেজিতে যেমন dark শব্দের প্রকৃত দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা আমাদের বোধ-গম্য হওয়া কঠিন, আমাদেরও তেমনি শ্যাম-শব্দের দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা সহজে বোধগম্য হয় না। নব-সজল-জলদ-শ্যাম, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম, ঘনশ্যাম, চিদ্‌ঘন-শ্যাম, তপ্তকাঞ্চন-শ্যাম, নবোৎপল-শ্যাম—কত রকমের শ্যামবর্ণ যে আছে, তাহা শেষ করিয়া উল্লেখ করা চলে না। এই শ্যাম-শব্দের ব্যাখ্যার উপরে আমাদের বহু দেব-দেবীর ও অবতারসকলের বর্ণ-পরিচয় নির্ভর করিতেছে। অথচ শ্যাম-রূপ যে কেমন রূপ, তাহাই আমরা জানিতে, বুঝিতে এবং ধারণা করিতে ভুলিয়াছি।

কালী-মূর্ত্তি

কালী-মূর্ত্তি যে কেমন, তাহার নির্দ্ধারণও কঠিন। প্রত্যেক পুরাণে ও তন্ত্রে কালীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ-বর্ণনা আছে; অনেক ক্ষেত্রে কতকটা বিরোধী

রূপ-বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার সামঞ্জস্য ঘটান বড়ই কঠিন। তবে একটা বিষয় ঠিক যে, কোন কবি, কোন পুরাণ, কোন তন্ত্র কালীকে নগী-বরণা বলেন নাই; নীলবর্ণের উল্লেখ আছে বটে, সে কেবল তারা-মূর্ত্তির বর্ণনায়, শ্যামা-রূপে নহে। কালীর দুই মূর্ত্তি, এক রণ-রঙ্গিণী, অপর মহাবিদ্যা বা আদ্যা-বিদ্যা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আদ্যা-বিদ্যার রূপ-বর্ণনা আছে। আমাদের হালিসহর গ্রামে বলদেঘাটার ঘাটের উপরে যে অতি পুরাতন সিদ্ধেশ্বরী কালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাহা শবশিব-প্রমাথিনী, অসিধারিণী রণোন্মাদিনী কালী নহেন; ছোট মেয়েটি সিংহাসনের উপরে বসিয়া আছেন। এই মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামপ্রসাদ অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের কোন গানেই কালীর ভীমা ভৈরবী সৃষ্টি-ধ্বংসকারিণী মূর্ত্তির বর্ণনা নাই। এখন যে শ্যামা-মূর্ত্তির পূজা হয়, তাহা শ্মশান-কালী; পূর্ব্বে কখনই ঐ মূর্ত্তির পূজা গৃহস্থ-গৃহে হইত না। রামপ্রসাদ জীবনে উমার তিন রূপের সাধনা করিয়াছেন,—উমা হৈমবতী, উমা মহেশ্বরী বা পাটেশ্বরী এবং উমা সর্ব্বাণী। সে বার্ত্তা তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য 'কালী-কীর্ত্তনে' প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী ছিলেন না; তিনি গৃহী ছিলেন; সুতরাং শ্মশান-কালীর উপাসনা করিবার অধিকারী তিনি ছিলেন না। কালীর যে যন্ত্র ও মন্ত্র, সে মন্ত্রগত যে ধ্যান, তাহার অনুরূপ আধুনিক কালী নহেন। রামপ্রসাদ কালীকে মনোমোহিনী রূপেই সাজাইয়াছিলেন, কখনও ঘোরা—ভীমা-রূপে দেখেন নাই, দেখানও নাই। তিনি বলিয়াছেন—"কে রে মনোমোহিনী ঐ? কে রে দৈত্যদলনা নলিনী-নয়না স্থিরদামিনী ঐ?" তবে রামপ্রসাদ তাঁহার লিখিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষাংশে শব-সাধনার বর্ণনা ইঙ্গিতে দিয়াছেন, তাহাতে কালীর রূপ-বর্ণনা নাই। অতএব কালীর মূর্ত্তি-বর্ণনা ঠিক-মত করিতে পারিলাম না। নীলকণ্ঠ কালীর রূপ-বর্ণনা একটু করিয়াছেন, তাহা এই,—

"ঐ শ্যামা গুণধামা বারণ মানে না রে—
রণে রণ-রঙ্গিণী ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে,
সমরে মগনা কালী করালবদনা ঐ।
বর নরকর কটিতটি শোভে মনোহর,
মুণ্ডমালা গলে দোলে, করে অসি এলোকেশী,
উলঙ্গিনী ঐ।"

শ্যাম ও শ্যামা

রামপ্রসাদই বাঙ্গালার প্রথম কবি ও সাধক, যিনি শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথমে গান করিয়া গিয়াছেন—

"তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে,
নাচ দেখি মা!
ব্রজে যেমন নেচেছিলে
হ'য়ে বনমালী—
অসি ছেড়ে বাঁশী ল'য়ে,
মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা ধ'রে,
তেমনি ক'রে নাচ দেখি মা!"

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের মুখে, পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে এ গান যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার মনে একটা স্থায়িভাব আমরণ বিদ্যমান থাকিবেই। ইহা ছাড়া, রামপ্রসাদের গান—"হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে," "নটবর-বেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লি মা রাসবিহারী" প্রভৃতি সমন্বয়ের গান অতি উপাদেয় ও অনুপম। এই ভাব-সমন্বয় ধরিয়া পরে কমলাকান্ত প্রভৃতি বহু ভক্ত কবি বহু গান রচনা করিয়া গিয়াছেন।

—নায়ক, ১৩২৮

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামা পূজার পর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। মা জাগিলে, ছেলে জাগিবে। ছেলেদের পূর্ণ জাগরণ ঘটিলে, তাহাদের স্মৃতি, ধৃতি, লজ্জা, নুতি সবই জাগিয়া উঠিবে। দেবী বুদ্ধিরূপিণী হইয়া তখন তাহাদের বুঝাই-বেন যে, তোমরা এক মায়ের ছেলে—সহোদর ভাই। এই বোধটুকু হইলে সকল ভাই মায়ের অঞ্চল ধরিয়া, মাতৃস্নেহের ছায়ায় হাস্যমুখে দাঁড়াইতে পারিবে।

তখন সহজা ধৃতিরূপিণী ভগিনী ভাইয়ের কপালে তিলক দিয়া ভ্রাতৃগণকে অক্ষয়, অজর, অমর, অচ্যুত করিয়া তুলিতে পারিবেন।

"ভায়ের কপালে
দিলাম ফোঁটা।
যমের দুয়ারে
প'ড়ল কাঁটা।"

এই ত সোজা কথা। ইহার প্রভাবে যমের দুয়ারে কেমন করিয়া কাঁটা পড়ে? সেই কথাটাই একটু খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

মনুষ্য-দেহ অজর-অমর হইতেই পারে না। এ সোজা কথাটা জগতের মানুষমাত্রেই বুঝে এবং জানে। তথাপি মানুষ কিন্তু অমর হইতে চাহে। এইটুকুই মনুষ্যত্বের বিশিষ্টতা। যখন দেহকে অমর করিতে পারি না, তখন দেহজ-বিশিষ্ট শক্তিকে অমর এবং অক্ষয় করিতে চাহি। তাই বংশের ধারা—জাতির ধারা রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র নানা স্থানে, নানা ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এই বংশের ধারা এবং জাতির ধারা অব্যাহত ভাবে সুরক্ষিত হইলে, জাতি এবং বংশ অমরত্ব লাভ করিতে পারে। কে জানে, কতকাল পূর্ব্বে তাহারা জন্মিয়াছিল! ইংরেজ বলেন, চারি পাঁচ হাজার বর্ষের পূর্ব্বে,—কোন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত অতীতে ব্যাস, বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন! আমরা কিন্তু এখনও তাঁহাদের পরিচয়ে পরিচিত হই-তেছি, সে পরিচয়ে শ্লাঘা বোধ করিতেছি। আমরা যদি মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতাম, বা অধুনা খৃষ্টান হইতাম, তাহা হইলে আমাদের এ পরিচয় এতদিনে লোপ পাইত। সঙ্গে সঙ্গে জাতির এবং বংশের ধারা ব্যাহত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। তাঁহারা যেমন মানুষ ছিলেন, আমরা তেমন মানুষ নাই বটে; পরন্তু তাঁহাদের সহিত আমাদের যে একটা সম্বন্ধ আছে, একটা বিশিষ্টতার ধারা তাঁহা-দের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সেই অজ্ঞেয় অজ্ঞাত কাল ভেদ করিয়া বর্ত্তমান কালেও দেদীপ্যমান আছে এবং আমাদিগকেও নিজের বলিয়া দাবী করিতেছে, —ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই পরিচয়, এই ধারাই জাতি এবং বংশের অমরত্বের বেদী। আমি কে, আমরা কে?—এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে, এখন হইতে বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত টানিয়া পিছু হটিয়া যাইতে হয়। এই পরিচয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ইহাই আমার মনুষ্যত্বের ধারা, আমার বিশিষ্টতার দ্যোতক। বাঙ্গালার মুসলমান যাহাই হউক না কেন,

যেখানকার হউক না কেন, জাতির এবং বংশের পরিচয় দিতে হইলে তাঁহাকে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের আরবদেশের কোরেশদিগের পরিচয় টানিয়া বাহির করিতে হয়। কেন না, তাহাই তাঁহার মনুষ্যত্বের শ্লাঘা। খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল জাতির সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই এমনই একটা অতীতের পরিচয় আছে। এই জাতিগত, বংশগত এবং ধর্ম্মগত ধারার বা প্রবাহের পরিচয় যে জাতির নাই, সে জাতি সভ্যই নহে, সে জাতির মধ্যে সংহতি-শক্তির বিকাশ নাই, সে জাতির পিতৃ-পরিচয় নাই।

এই ধারার খবর, এই বৈশিষ্ট্যের উপাদান-পরম্পরা পাই কেমন করিয়া এবং কোথা হইতে? আমি কাহার এবং আমরা কাহারা?—এই দুই প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারিলেই বৈশিষ্ট্যের খবরটা আপনা হইতে খুলিয়া যায়। আজ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় সেই খবরটা পাইবার একটা শুভক্ষণ। কাল-সহোদরা কালিন্দী যমুনা আজ সমষ্টিকৃত সমবেত ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়া বলিতেছেন,—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে প'ড়ল কাঁটা।"

আমি ফোঁটা দিলেই ভাইয়ের-যমের দুয়ারে, নাশের—লোপের পথে কাঁটা পড়িবেই। কেননা, আমি যে যমুনা—যম-সহোদরা। আমি যে অনন্তকাল-প্রবাহিনী কালিন্দী! কালস্রোতের অজস্র নীল জলরাশি বহন করিয়া আমিই অনন্ত কাল, কুল-কুল—কল-কলরবে বহিয়া যাইতেছি। আমার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ব্যাঘাত নাই, স্তম্ভন নাই; আমি কেবলই চলিতেছি এবং দেখিতেছি। জগতের কত অসংখ্য অর্ব্বুদ পরিবর্ত্তন দেখিলাম, আরও কত দেখিব। আমারই দুই তটে অখণ্ড দণ্ডায়মান হইয়া বিরাজ করিতেছেন আমার সহোদর মহাকাল। আমি গতি-রূপিণী চপলা, চঞ্চলা বালিকা; ভাই আমার স্থিতিরূপ, ধীর, স্থির, সনাতন, কাল-পুরুষ। আমি গতি, সে স্থিতি। আমি শক্তি—সচল, সবেগ শক্তি; সে শান্ত দান্ত সমাহিত সনাতন পুরুষ। সে এমন কেন হইল—জান? ভগিনী সহোদরা আমি, আমারই অতি সোহাগের টিকা পাইয়া সে এমন চিরজীবী হইয়াছে। তোমরা আমার মতন এমনই সোহাগ ও স্নেহভরে টিকা দিতে পারিলেই তোমাদের ভাইদের, আমার ভাইয়ের মত মৃত্যুঞ্জয় সনাতন পুরুষ করিয়া তুলিতে পারিবে।

মা-বাপের ঠিক খবর জানিতে না পারিলে ভাই-ভগিনীর সম্বন্ধটা ঠিকমত জানিতে পারা যায় না। তাই বলিতে হইয়াছে—জাগিয়ে দে চৈতন্যময়ি,

এবার আমরা সবাই জাগিয়া দাঁড়াই। জাগিয়া উঠিলেই, চোখ রগড়াইয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব—আমরা কে, আমরা কাহাদের। সেটুকু বুঝিতে ভুলিয়াছি বলিয়াই ত ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হইয়াছি,—সহোদরকে সহোদর ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ দেখাইতেছে, আঁচড়াইতেছে—কামড়াইতেছে। পরিচয়-বিভ্রাট ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ দলে দলে আমরা বিভক্ত, আজ আমরা প্রত্যেকে ওস্তাদ, এবং গুরুপদপ্রার্থী ; পরিচয়-বিভ্রাট ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এক দল অপর দলের নিন্দা করিতেছে, সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে ; পরিচয়-বিভ্রাট বিষম ও বেজায় ভাবে ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা পরাজিত-পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরপদ-লিপ্সু, পরের ধারায় নিজের নিজের পিতৃ-পরিচয়ের ধারা ডুবাইতে মিশাইতে প্রয়াসী। জননীর হাত ধরিয়া মানুষ পিতাকে চিনিয়া থাকে, পিতৃ-পরিচয় লাভ করিয়া থাকে। মায়ের কোলে বসিতে পারিলেই বালক বাপের বেটা হইতে পারে। তাই শ্যামাপূজার দিনে কাতরস্বরে বলিয়াছিলাম—

"জাগিয়ে দে চৈতন্যময়ি !
এবার আমি জেগে যাই।
মহামায়ার মোহপাশে
আর যেন ঘুমাতে না চাই।"

শ্যামা জন্মদে, তোমারই ক্ষীরনীর-ধারা পান করিয়া আমাদের মনুষ্য-দেহ পুষ্ট হইয়াছে ; তুমিই আমাদের জননী-ধাত্রী। জাগিয়ে দে মা। সম্মুখে, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, ভগিনী যমুনাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার চঞ্চল চম্পক অঙ্গুলি হইতে বিজয়-টীকা গ্রহণ করিতে হইবে। সে টীকা পাইলে আমি—আমরা অমর হইব, অবিনাশী সনাতন পুরুষ হইব। তুমি জাগিলে আমি জাগিব ; আমরা মায়ে-পোয়ে জাগিয়া বসিলে আমাদের ভাই-ভগিনীদের বাছিয়া লইতে কষ্ট হইবে না। সে জাগরণ হইয়াছে কি ? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এবং আমাদের বাছাইও ঠিক-মত হইয়াছে—আমাদের যম-দ্বিতীয়ার ফোঁটাও আমাদের ভালে নীলারুণের মত শোভা পাইবে।

মায়ের কোলে শিশু ঘুমাইয়া আছে,—নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে সে ঘুমাইতেছে। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গে, তখন সে নয়ন মেলিয়াই মায়ের মুখখানি দেখিতে পায়। সে অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখিয়া, শত নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র-নিঙ্ড়ান সুধা-মাখান পূর্ণাবয়ব পূর্ণশ্রী মাতৃমুখ দেখিয়া শিশু সোহাগের হাসি হাসে। সে ভাবে—আমার মায়ের মতন আর কাহারও এমন মা আছে কি ? এমন সুন্দর, এমন

মনোহর, এমন অনুপম, এমন অতুল্য ও অদ্বিতীয় মা আর আছে কি ? শিশু মায়ের মুখে কোন দোষ, কোন চ্যুতি দেখিতে পায় না। জাগিয়া উঠিয়া, মায়ের কোলে শুইয়া দেখিলে অমনিই দেখায়। জাগিয়াছ যদি, তাহা হইলে শিশুর মতন নয়নময় হইয়া মাতৃমুখ দেখ দেখি ? তেমন নিষ্কলঙ্ক এবং নির্ম্মল-ভাবে মায়ের শ্রীমুখ দেখিতে পারিলে, আদরিণী, সোহাগিনী-ভগিনী যমুনা, একপিঠ চুল এলাইয়া বিলোল-কটাক্ষে তোমার উপর স্নেহ-সোহাগ ঢালিয়া দিয়া তোমার কপালে যম-ভয়-নিবারক, মরণ-ভয়-প্রতিষেধক এমন জয়-টীকা পরাইয়া দিবে, যে টীকার—যে ফোঁটার জ্যোতিতে তুমি জগজ্জয়ী হইবে। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী যাহাদের জননী, তাহাদের ভগিনী কালিন্দী-যমুনা ত বটেনই। যিনি কালের সহোদরা কালিন্দী, যিনি কালকলয়িনী মহাকালীর কন্যা—জঠরজাতা গতি-শীলা। আমিও চিরকাল আছি, তিনি চিরকাল আছেন। আমি সনাতন, তিনি সনাতনী। কেন না, আমরা উভয়ে আদ্যাশক্তি সনাতনীর পুত্র-কন্যা—সন্তান-সন্ততি।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় আর একটু মজার কথা লুকান আছে। কেবল তুমি জাগিলেই হইবে না, ভগিনী কালিন্দীকেও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ভাই-ভগিনী একসঙ্গে না দাঁড়াইলে মায়ের আদর করিবে কে ? ভাই রে, আমরা সব কালের পরিবার—শ্যামার সন্ততি। মা আমাদের কালী—শ্যামা—বারিদবরণা ; ভগিনী আমাদের শ্যামসোহাগিনী, শ্যামাঙ্গী, কালিন্দী-যমুনা—আমরা সবাই কাল। এখন জাগিয়াছ যদি, তবে এই কাল রূপের, শ্যাম-বিতানের আদর কর না ? ইহার বড়াই, ইহার শ্লাঘা, ইহার দর্প-দম্ভ প্রকাশ কর না ? ছার তোমাদের শ্বেতাঙ্গ—শ্বেতাভ-শ্বেতকায়! ছার তোমাদের অরুণরাগ-সমুদ্ভাসিত, রক্তিম-গোলাপ-বিস্তার! দেখ দেখি, আমার কালো বরণ কেমন ?

"নব-সজল-জলদ-কায়
হেরিলে আঁখি জুড়ায়।"

নব-সজল-জলদ-বর্ণ, স্নিগ্ধ-শান্ত-শ্যাম-শোভা, শ্যাম-শ্যামার অপরূপ সম্মেলন-বিভা—কত মধুর, কত সুন্দর, কেমন মনোহর! নীল আকাশ সেই শ্যামের প্রতিচ্ছায়া, পয়োনিধির নীলাম্বুরাশি সে বিভার অনুকারী, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সে রূপের নমুনা মাত্র—পত্র-পল্লব, ব্রততী-বল্লরী, সে শ্যাম-রূপ লইয়া লোফালুফি করিতেছে ; ধূম্রগিরিরাজমেখলা সে শ্যাম-রূপের স্থির ধীর বিকাশ। এমন কাল রূপের আদর কর না ? জাগিয়াছ যখন, তখন, নীল নয়নে এমন

নিত্য নীলবরণকে নয়ন ভরিয়া দেখ না কেন? জাগিয়াছ যখন, তখন এমন শ্যাম-রূপের সাকার ও সাবয়ব বিকাশ শ্যামাঙ্গী যমুনা ভগিনীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহারই হাতে সোহাগের বিজয়-টিকা গ্রহণ কর না? তোমাদের কানন-কুন্তল দেশের, তোমার গগন-পবনের, তোমার নদ-নদীর, তোমার আকাশ ও সাগরের চিরস্থায়ী শ্যাম-শোভাকে নিঙড়াইয়া, তাহাকে ভগিনীরূপে সম্মুখে বসাইয়া, তাহার ফুল্লারবিন্দ হাসিমুখের ফোঁটাটি গ্রহণ কর না? এতকাল পরঘরী, পরদ্বারী ছিলে—এত কাল মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া স্বপ্নঘোরে কেবল শ্বেত ও লোহিতের বাহার দেখিতেছিলে, নিজের শ্যাম-চর্ম্ম ছিঁড়িয়া তুলিয়া শাদার দলে মিশিতে চাহিতেছিলে। তোমার শ্যামা মায়ের কোলে যখন জাগিয়াছ, মায়ের শ্যাম-শোভা যখন প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছ, তখন শ্যামাঙ্গ ভাইদের হাত ধরিয়া শ্যামা মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্যামাঙ্গীর এবং শ্যামলীলা-বিলাসিনী ভগিনী কালিন্দীর হাতের ফোঁটাটা আজ হেঁট মুণ্ডে গ্রহণ কর না? যে মরণ-ভয়ে আজ আকুল হইয়া উঠিয়াছ, সে মরণ-ভয় আর থাকিবে না। সে যম—মৃত্যু-বিস্মৃতির ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া একে একে তোমার অতীতের কত গৌরবের, কত স্পর্দ্ধার বৈশিষ্ট্য—তোমার বংশের ধারা, জাতির ধারা, ধর্ম্মের ধারা, সভ্যতার ধারা, বিশিষ্টতার ধারা গ্রাস করিতেছিল, সে ভগিনীর স্নেহের টিকা দেখিয়া আর তোমাকে গ্রাস করিবে না, এবং যে সকল গ্রাস করিয়াছে, তাহা উগারিয়া দিবে। জাগিয়াছ যদি, তবে গ্রহণ কর,—ভাই ভাই এক ঠাঁই হইয়া, হাত ধরাধরি করিয়া, শ্যাম-শোভায়—শ্যাম-সোহাগে প্রমত্ত হইয়া শ্যামা ভগিনী—কালিন্দী সহোদরার বামাঙ্গুলীর স্নেহের ফোঁটা আদরে গ্রহণ কর। তোমার কল্যাণ হইবে—তুমি আবার পূর্ব্বজদিগের মত অমর অজর অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

—নায়ক, ১৩২৩

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-পূজা

পঞ্চানন তর্করত্ন

মা আশ্বিন শুক্ল-নবমীতে—মহানবমীতে—দশভুজা, কার্ত্তিক শুক্ল-নবমীতে চতুর্ভুজা ; এমনই বিবিধ-রূপে জগৎপালন যুগে যুগে করাই যে মা'র স্বভাব। ধাত্রী জননী ; ধাত্রী পালনকারিণী। জগতের যিনি ধাত্রী, তিনিই জগদ্ধাত্রী।

প্রকৃত জগৎপালন অসুর-নাশ দ্বারা হয় না,—অজ্ঞান-নাশেই জগৎপালন প্রকৃত পক্ষে হয়।

অসুরের অধিকারে অজ্ঞান প্রবল হয়; অজ্ঞান-প্রবলতা-নিবারণের জন্যই জগজ্জননীর অসুর-বিনাশ-লীলা।

অজ্ঞানেই জগৎ বিশীর্ণ হয়, গলিত হয়, স্খলিত হয়। অন্ধকারে সোপান হইতে মানবের পদস্খলন যেমন অজ্ঞানবশতঃই হয়,—সেইরূপ, সমাজের যে সুনিয়ন্ত্রিত শান্ত গতি—তাহার ভঙ্গ বহুজনের অজ্ঞানবশেই হইয়া থাকে। ইহা বক্তৃতা নহে, প্রত্যক্ষ। ইউরোপের যে ধন-তৃষ্ণার অতিবৃদ্ধি—বুদ্ধি-মদের ও বল-মদের আধিক্য—তাহা অজ্ঞানেরই ফল।—সেই অজ্ঞানই তাহা-দিগের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিল, সেই অনলে —রাজা, রাজ্য, লক্ষ লক্ষ মানব, মনুষ্যত্ব, সত্য, শান্তি ভস্মীভূত হইয়াছে। সেই ভস্মস্তূপ বিকীর্ণ হইয়া এই ভারতকেও ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের যে দৃষ্টিশক্তি নানা বাধায় ক্ষীণ হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে ছিল, ভস্ম-প্রক্ষেপে তাহা ক্ষীণতর হইয়াছে। ইহা অজ্ঞানেরই রূপ।

এই অজ্ঞান-অপসারণ মা না করিলে আর কে করিবে?—তাই মা আসিয়াছেন।

যদি বল, কত কালই ত মা আসিতেছেন, জগৎ ছাড়িয়া দিই (কেননা, সর্ব্বত্র তাঁহার আগমন নাই), বাঙ্গালার পালন কি হইতেছে?—অজ্ঞানই দিন দিন বাড়িতেছে বৈ ত কমিতেছে না।

হাঁ, উপস্থিত এই প্রশ্নটা কঠিন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে ইহা খুব সহজ।

রোগের যেমন একটা ভোগ-কাল আছে, অজ্ঞানেরও তেমনই ভোগ-কাল আছে। সুচিকিৎসক রোগকে জোর করিয়া তাড়ায় না, রোগীর জীবন রক্ষা করিয়া রোগের অনুবর্ত্তন করে, রোগ যাহাতে রোগীর জীবন হরণ করিতে না পারে—সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রোগবৃদ্ধি হইলেও তাহার সদ্যঃ-প্রতীকারে যত্ন করে না। মা তাই অজ্ঞানের ভোগ-কালে অজ্ঞানকে দূর করিতেছেন না, কিন্তু সমাজ সেই অজ্ঞান-রোগে একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, তাহারই জন্য মা মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন,—দুই দশজন সাধকস্বরূপ সমাজ-মুখে সাধনার ঔষধ ঢালিয়া দিবার জন্য। মুমূর্ষু রোগী অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইলেও—মৃত্যুগ্রস্ত যে হয় নাই তাহা মা-এর প্রভাবে। ক্রমে সেই সাধনা-ঔষধই সমগ্র সমাজকে, সমগ্র বাঙ্গালাকে, সমগ্র ভারতকে, সমগ্র ভূমণ্ডলকে অজ্ঞানমুক্ত করিবে।

মা আমার যে মহামায়া,—তিনি যেমন মহাবিদ্যা, তেমনই মহামোহ,—আপনারই রূপান্তর অজ্ঞান, মহামোহ; সেই রূপ-সংবরণে আপনিই চিকিৎসক, আপনিই মহাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা।

তাই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী অজ্ঞান-নাশিনী জগদ্ধাত্রীর পূজা।

ইউরোপীয় সমরানলের ভস্মে যাহাদিগের চক্ষু আচ্ছন্ন, তাহারা বলে, মার এই পূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কল্পিত,—ওরে পাগল,—মা যে আমার শাশ্বতী, তাঁহার পূজাও শাশ্বত, সনাতন। এই পূজা বা সাধনা-ধারার বিরাম নাই, তবে ন্যূনাতিরেক আছে, অজ্ঞানে ন্যূনতা, জ্ঞানে বৃদ্ধি। অজ্ঞানে যেমন সাধনার ন্যূনতা, তেমনই জগতের অপচয়, যেমন সাধনার বৃদ্ধি, তেমনই জগতের উপচয়।

১৭৫৭ খৃঃ অঃ ইংরেজ বাঙ্গালা অধিকার করেন, তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভবকাল। তাহারও দুই শত বৎসর পূর্ব্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সমগ্র বাঙ্গালার ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও এই রঘুনন্দনের 'একাদশী-তত্ত্বে'র কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। রঘুনন্দনের পূর্ব্বেও পঠদ্দশায় যাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্মার্ত্ত হইতে হইত, রঘুনন্দনেরও অন্যূন দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সেই মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির 'ব্রতকালবিবেক' গ্রন্থে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

> 'কার্ত্তিকে'মলপক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমে'হনি।
> পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম্।'

শূলপাণিরও পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিসাগরে আছে—

> 'কার্ত্তিকস্য যুগাদ্যায়ামৃদ্ধিকামো'র্চ্চয়েদুমাম্।'

কার্ত্তিক মাসে শুক্ল-নবমীই একমাত্র যুগাদ্যা, আর কোন তিথিই যুগাদ্যা নহে।

'বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং কৃতং যুগম্। কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতার্থ-নবমে'হনি। অথ ভাদ্রপদে কৃষ্ণ-ত্রয়োদশ্যাস্তু দ্বাপরম্। মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতম্।' স্মার্ত্তধৃত ব্রহ্মপুরাণ-বচন এবং 'কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মাঘমাসে চ পূর্ণিমা' এই বৃহন্নারদীয়পুরাণ-বচনাদি ইহার সর্ব্বদেশমানিত প্রমাণ। স্মৃতিসাগরধৃত বচনে যে 'উমাম্ অর্চ্চয়েৎ'—উমার অর্চ্চনার বিধি আছে, তাহাতে উমা-শব্দের উল্লেখ কেনোপনিষদের সেই 'উমাং হৈমবতীং'কে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

বঙ্কিমবাবুর দুর্গাপূজা-ব্যাখ্যা—"ভাদ্র মাস সিংহরাশি, তাহার পরেই কন্যা —আশ্বিন মাস, তাই সিংহপৃষ্ঠে কন্যা দুর্গা।"—এখানে তাহা লাগে না, ইনিও সিংহপৃষ্ঠে, কিন্তু কন্যা নহে—তুলা—কার্ত্তিক মাস।

কাজেই সব যদি সংলগ্ন করিতে হয়, ত—পশুবলের উপর আত্মশক্তি, রজস্তমঃ-র উপর চিৎশক্তিরূপে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব বুঝিতে হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'তমসঃ পরস্তাৎ'। সেই চিৎশক্তি এখন সোপাধি মূল প্রকৃতিকে অহংভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন। বুঝিবে, তিনি নিরুপাধি হইয়াও সোপাধি, নিরাকারা হইয়াও সাকারা।'

কেনোপনিষদের কথা সুস্পষ্টাকারে কাত্যায়নী-তন্ত্রে ৭৭ পটলে আছে, তাহা একবার শুন,—'পুরা পুরন্দরমুখাঃ স্বেশ্বরত্বাভিমানিনঃ। প্রাহুঃ কিমীশ্বরো'স্ত্যস্মদতিরিক্তং সুরানিতি। (অস্মাকমেবায়ং মহিমা, কেন উপঃ।) অথ দুর্গা জগন্মাতা নিত্যা চৈতন্যরূপিণী। এতেষাং ধর্ম্মবাতৃণা- মিন্দ্রাদীনাং নিরস্তনম্। করিষ্যামীতি নিশ্চিত্য জ্যোতীরূপং দধাত্যলম্।— তেষামাবিরভূদ্দুর্গা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী। কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রাযুত- সমপ্রভম্। অনন্তং পর্ব্বতমিব সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্। তদ্দৃষ্ট্বা সুরাঃ সর্ব্বে ভয়মাপুর্মহৌজসঃ। কিমেতন্ন বিনিশ্চেতুং শক্তাস্তে হ্যভবন্ সুরাঃ। বায়ুমাহুঃ --- কিমেতদ্ বিজানীহি --- (কিমেতদ্ যক্ষমিতি, কেন উপঃ)" ইত্যাদি।

অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের অহঙ্কার হয়—আমরাই ঈশ্বর, আবার ঈশ্বর কে? ধর্ম্মপালক দেবগণের সুশিক্ষার্থ ব্রহ্মরূপিণী জগদ্ধাত্রী দুর্গা অদ্ভুত অনন্ত পর্ব্বত-সদৃশ মহাজ্যোতিঃ-রূপে অদূরে দেবগণের দৃষ্টিগোচর হইলে, দেবগণ ভীত হইলেন এবং মন্ত্রণাপূর্ব্বক বলিলেন, বায়ু, তুমি সদাগতি বীর, জান এই অদ্ভুত বস্তু কি?

বায়ু জ্যোতির সম্মুখে উপস্থিত হইলে, জ্যোতিঃ হইতে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল,—কে তুমি? বায়ু বলিলেন,—আমি বায়ু। প্রশ্ন হইল,—তোমার শক্তি কিরূপ? উত্তর,—জগতের সকল বস্তু আমি আত্মসাৎ করিতে পারি। জ্যোতিঃ বলিলেন,—"হাঁ, এই তৃণটি আত্মসাৎ কর দেখি"। বায়ু সর্ব্বশক্তি- প্রয়োগে চেষ্টা করিয়াও তৃণ নড়াইতে পারিলেন না। বায়ু লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যাইলে দেবগণ অধিকতর ভীত হইয়া অগ্নিকে পাঠাইলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনের পর অগ্নি যখন তৃণ-দাহে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ নিশ্চয় করিলেন, ইনিই ঈশ্বর। তখন স্তব করিলেন, সুগোপ্য-রূপ-প্রদর্শনের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া

নাগ-যজ্ঞোপবীতিনী রক্তবস্ত্রপরিধানা বিবিধভূষণভূষিতা চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী-রূপে দেবগণকে ঈশ্বরী দেখা দিলেন ('তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম উমাং হৈমবতীং বহুশোভমানাম্'—কেনোপনিষদ্)।

উপনিষদ্-ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাও বলিয়াছেন, মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্‌গীতা-পর্ব্বে যে দুর্গা-স্তব আছে (ভীষ্মপর্ব্ব, ২৩ অঃ) তাহাতেও বলা আছে, 'ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাম্'। ব্রতকালবিবেক ও স্মৃতি-সাগরেরও বহুপূর্ব্ববর্ত্তী তন্ত্রে উপনিষদে ও মহাভারতে জগদ্ধাত্রী দুর্গার সন্ধান পাইতেছি—তিনি ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা অপরোক্ষ হইলেই স্বয়ং ব্রহ্ম। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম" (শ্রুতি)।

তন্ত্র-বিদ্বেষী কুতার্কিক বলিতে পারেন, "উমা ব্রহ্মবিদ্যা হইলেও—দুর্গা ব্রহ্মবিদ্যা হইলেও—তন্ত্র ব্যতীত কোন্ প্রমাণে তাঁহাকে জগদ্ধাত্রী বলা যায়? আর তন্ত্র ত সেদিনকার তৈয়ারি, তাহার আবার প্রামাণ্য কি?"

উত্তর দিতেছি।

শ্রীভগবদ্‌গীতা-পর্ব্বেই দুর্গা ব্রহ্মবিদ্যা নামে কথিত হইলেন, অথচ "ভগবদ্-গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এই পুষ্পিকায় শ্রীভগবদ্‌গীতাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে,—এই দুই অংশ এক সুরে বাঁধিয়া লইলেই উত্তর সহজবোধ্য হইবে। কথাটা এই—কাদম্বরী বাসবদত্তা—গ্রন্থের নাম, কেননা ঐ নামের নায়িকাকে অধিকার করিয়া ঐ সব আখ্যায়িকা রচিত, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ দুর্গাকে অধিকার করিয়া গীতা রচিত বলিয়া গীতার নামও ব্রহ্মবিদ্যা। অতএব দুই অংশে মিল আছে। গীতা যে দুর্গা-স্তোত্রেরই ব্যাখ্যা, তাহা আমি নানা প্রবন্ধে পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি এবং মৎ-প্রণীত গীতা-দেবীভাষ্যে তাহার বিশদ বিবরণ আছে,—সেই ভাষ্য-ব্যাখ্যাত গীতার একটি শ্লোক আজ প্রমাণ-স্বরূপে ব্যবহার করিব, এই দুর্গা যে জগদ্ধাত্রী, তাহাই সিদ্ধ করিবার জন্য।

দুর্গার নানা মূর্ত্তি থাকিলেও মন্ত্র-ভেদে তাহার তথ্য স্বরূপ আগমজ্ঞগণ সহজে ধরিতে পারেন।

গীতায় জগদ্ধাত্রী-মন্ত্র আরাধনা করিতেই অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উপদেশ, সুতরাং জগদ্ধাত্রী মাতাই দুর্গা ও ব্রহ্মবিদ্যা। সাহেব বা সাহেবী-শিক্ষায় শিক্ষিতগণ যাহাই বলুন—মন্ত্র যে অতিপ্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এবং মন্ত্র যে বিশেষ গোপনীয়, ইহা সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বদেশ-বিদিত। গীতাতেও যে জগদ্ধাত্রী-মন্ত্রের উপদেশ আছে, তাহা গুপ্তভাবেই আছে—অথচ সেই মন্ত্র

না থাকিলে 'গীতা-পর্ব্বের' দুর্গাস্তোত্র ও গীতার পরস্পরসঙ্গতিই থাকে না। যে শ্লোকে জগদ্ধাত্রী-মন্ত্র উপদিষ্ট, তাহা এই :—

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥"

গীতা ২য় অঃ।

পদচ্ছেদঃ। দূঃ। এণহী। অবরং। কর্ম্ম। বুদ্ধিযোগাৎ। ধনং। জয়। বুদ্ধৌ। শরণমনু। ইচ্ছ। কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।

অন্বয়ঃ। হে জয়, এণহী দূঃ বুদ্ধিযোগাৎ অবরং ধনম্ ভবতীতি শেষঃ শরণমনু কর্ম্ম বুদ্ধৌ ইচ্ছ। ফলহেতবঃ (পুরুষাঃ কৃপণাঃ ভবন্তি)।

অর্থঃ। এণং মৃগং জিহীতে প্রাপ্নোতি এণহশ্চন্দ্রঃ মৃগলাঞ্ছনত্বাৎ। চন্দ্রশব্দেন আগমপ্রসিদ্ধসঙ্কেতাদ্ বিন্দুরর্থো লভ্যতে। তদ্বান্ এণহী। দূঃ ইতি প্রথমান্তঃ বীজাদিসমস্বর-ব্যঞ্জনবর্ণঃ। এতেন জগদ্ধাত্র্যা একাক্ষরী বিদ্যা লব্ধা। বুদ্ধিযোগাৎ উপদেশজজ্ঞানসম্বন্ধাৎ অবরং নাস্তি বরং শ্রেষ্ঠং যস্মাৎ তৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং ধনং ভবতি। যথা বিষয়িণাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠধনং কাম্যং চ লব্ধং সৎ গোপ্যঞ্চ ভবতি তদ্বৎ। (অতঃ) শরণ-মনু কর্ম্ম শরণং রক্ষকো মনু-রেতন্মন্ত্রো যস্মাৎ শরণম্ আশ্রয়ঃ মনুরেতন্মন্ত্রো যস্যেতি বা (মনুশব্দস্য মন্ত্র-সামান্যবাচকত্বে'পি অত্র প্রক্রান্তত্বাদেতন্মন্ত্রপরত্বম্) এবংভূতং কর্ম্ম জপরূপং বুদ্ধৌ ইচ্ছ, অস্য মন্ত্রস্য মানসজপং কুরু ইত্যর্থঃ "বিধিযজ্ঞাদ্ জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ। উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ। ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্। উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ" ইত্যুক্তঃ।

অস্য যুক্তত্বং বোধয়তি—ফলহেতবঃ কৃপণাঃ কামতন্ত্রতয়া অলব্ধমন্ত্রাঃ, কৃপণা ভবন্তি। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বা যঃ প্রৈতি স কৃপণ ইতি শ্রুতিঃ দূযুক্তম্ আকাশস্বরূপং বিন্দুভূতমক্ষরং জগদ্ধাত্র্যা একাক্ষরীং বিদ্যামবিদিত্বা অলব্ধ্বা পরলোকগতস্য দুঃখং জ্ঞাপয়তি। অত্র চ গীতা-মন্ত্রে তদনুবাদঃ। জয় ইতি অর্জ্জুনস্য নামান্তরং "ততঃ শ্বেতহয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীদজিতং জয়ঃ" ইতি। দ্রোণপর্ব্ব সপ্তবিংশাধ্যায় তৃতীয় শ্লোকে। যথার্হং সংবিভজ্যৈতান্ বস্ত্রে পর্য্যা-দদজ্জয়ঃ। ইতি মৌষলপর্ব্ব-সপ্তমাধ্যায়-পঞ্চ-সপ্ততিতমশ্লোকাদৌ চ প্রয়োগাৎ। অর্থাৎ হে অর্জুন, জগদ্ধাত্রীর একাক্ষর-মন্ত্র গুরূপদেশাদিজনিত জ্ঞানে নিলিত হইলে, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন। তুমি মন্ত্রের রক্ষণ-শক্তি-হেতু কর্ম্ম অর্থাৎ জপ

মানস পদ্ধতিতে কর,—ফল-কামনায় ভ্রান্ত মানব এই মন্ত্র লাভ করিতে না পারিয়া দুঃখভোগই করিয়া থাকে।

অতএব, এই জগদ্ধাত্রী-পূজা আধুনিক নহে,—কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের নহে, ৫।৭ শত বৎসরেরও নহে,—যাগযজ্ঞাদি বৈদিক সাধনার ন্যায় ইহা পরম্পরা-ক্রমে অনাদি। এই সাধনায় দেবগণের এক সময়ে অজ্ঞান-নাশ হইয়াছিল, কৃপাময়ীর কৃপায় বাঙ্গালার অজ্ঞান কবে বিনষ্ট হইবে—তাহার প্রত্যাশায় সাধক ব্যাকুলভাবে চাহিয়া আছে।

—বঙ্গবাসী, ১৩৪০

নবান্ন

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

মা আসিয়াছেন! উঠানে-আঙিনায়, ক্ষেত্রে-খামারে তাঁর চরণের অলক্তরাগ দেখিতে পাইয়াছি। কত স্নেহ মায়ের আমার! তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছি, অথচ জননী আমার সন্তান-স্নেহে পাগলিনী। ঝাঁপি ভরিয়া অমৃত-কণিকা বহিয়া আনিয়া আমাদের শীর্ণ ওষ্ঠে রস সঞ্চার করিতেছেন। কত ভালবাসা মায়ের আমার। আর এমন মাকে আমরা ঘরের বা'র করিয়া দিয়া উল্কামুখী অলক্ষ্মীর ভজনা করিতেছি।

যাহা হউক, নবান্ন-তত্ত্বটি কি, আজ তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইব, আর সেই সঙ্গে অনুধাবন করিব হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যটি।

আদিম ঊষা হইতে হিন্দু জাতি যজ্ঞ-পরায়ণ। যজ্ঞ কি?—যজ্ঞ ত্যাগ, দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ। যাহা ভোগ্য, যাহা লালসার, যাহা কেবলমাত্র পাশব-প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার, তাহার ভোগে, তাহার গ্রহণে, তাহার ব্যবহারে, ব্রহ্ম-ভাবের বিলুপ্তি ঘটিয়া পশুত্ব বৃদ্ধি পায়। সেই জন্যই যজ্ঞের অনুষ্ঠান—ত্যাগের সাধনা। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই আদেশ। এই ত্যাগ আর কিছুই নহে—সান্তের সহিত অনন্তের সংযোগ—ক্ষুদ্রের সহিত বৃহতের সম্মিলন, পশুর অন্তরে দেবতার প্রতিষ্ঠা, সসীম অহং-বোধটিকে অসীম ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া দিয়া—পশু-জীবনের শুদ্ধি- এবং সার্থকতা-সম্পাদন।

হিন্দুর অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর ও ব্যাপক ছিল এই যজ্ঞেই তাহার প্রমাণ। হিন্দুর যে পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, তাহা যজ্ঞেরই প্রকার-ভেদ। দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, ইহাই পাল-পার্ব্বণের মূল রহস্য।

নূতন ধান্য হইয়াছে—আশায় বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। সম্পদ্-সৌভাগ্যে মাতোয়ারা কেবল এইটুকু ধারণায় মানুষকে পশু, লোভী ও সঙ্কীর্ণচিত্ত করে। কেবল এই ধারণাটি রহিলে পরস্ব-অপহরণের প্রবৃত্তি হয়, আসুরিক স্বেচ্ছাচার মনুষ্যত্বকে লোপ করিয়া দেয়, হিন্দু তাই অন্য দৃষ্টি দিয়া জীবনের বিচার করে।

ধান্য লক্ষ্মী, ভগবানের কৃপা। উহা আমার নহে। ভগবতীর বাৎসল্য-ধারা মূর্ত্তিমতী হইয়া ধান্য-সম্পদ্-রূপে আমার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে। লক্ষ্মীকে লক্ষ্মী-রূপেই বরণ করিতে হয়, আর যাঁহার করুণা ধান্যের স্বর্ণাবিরণের অন্তরালে শস্য-রূপে প্রাণপ্রদ, তাঁহারও পূজা করিতে হয়। তবে ইহার মহিমা থাকে, আমার জীবনেরও সার্থকতা হয়। নবান্ন এই ভাবটিরই অভিব্যঞ্জনা।

তাই নবান্নের দিনে শুদ্ধ-স্নাত হইয়া দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া আত্মীয়-স্বজন-পরিবারের সহিত এবং পাড়া-প্রতিবাসীকে ডাকিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া নবান্ন-পার্ব্বণ পালন করিতে হয়। রসাল সুগন্ধি নূতন অন্ন যখন গ্রহণ করিব, তখন সেই বিশাল রস-সিন্ধুতে মিলিয়া যাইব, তবে তো অন্নের মহিমা রহিবে! কেবল শুধু ক্ষুধার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলে রসের হ্রাস হয়, মিষ্টত্ব লোপ পায়, অমৃত-আস্বাদ থাকে না। যেখানে উৎসর্গ নাই, দেবতার উদ্দেশে নিবেদন নাই, সেখানে কেবল অনিবার্য্য অতৃপ্তি, জ্বালাময় ভোগ-লালসা।

নবান্নের অন্ন আমরা একা গ্রহণ করি না। আত্মীয়-স্বজনকে দিই, পাড়া-প্রতিবাসীকে বিলাই, গ্রামের সকলকে সাধিয়া বিতরণ করি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সকলকে অর্পণ করি। কেন? না করিলে আমি পশু হইয়া যাইব। ধারা-চ্যুত হইয়া পঙ্কিল পল্বলে পরিণত হইব। বিরাটত্বে ব্রহ্মত্বে আমার চরম পরিণতি। আমার অনুভূতিও বিরাট্ হওয়া চাই। তাই ঐ অন্নদানের ব্যাপকতা। আমার যে ক্ষুধা, তাহা যে বিশ্বেরও ক্ষুধা। ইহাই নবান্ন-তত্ত্ব।

—সন্ধ্যা

পৌষ-পার্ব্বণ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষে বর্ষে পৌষ-পার্ব্বণ আসে ও যায় ; কিন্তু আগেকার মতন এই পার্ব্বণ-উৎসবে বাঙ্গালীর প্রাণটা তেমন মাতিয়া ও নাচিয়া উঠে কি ? সে পিঠে-পুলি খাইবার আমোদ, সে 'বন্দ মাতা সুরধুনী' গানের লহর, সে হাসি-ঠাট্টা, ফুলের সাজ, বেশের ঠাট আর আছে কি ? গঙ্গা-স্নানে ভিড় হয় বটে, সাগরে অত্যধিক যাত্রী যাইতেছে বটে, কিন্তু তেমন ফুলমালার, লতাপাতায় নৌকা সাজাইয়া নাচ-গান করিতে করিতে ত্রিবেণী-স্নানে যাইবার ধুম নাই। হাসি গিয়াছে, উল্লাস গিয়াছে ; আছে সেকালের মরা বিধি-পদ্ধতি। গঙ্গা-স্নান করিতে হয়, তাই অনেকে গঙ্গা-স্নান করে, বিশেষতঃ বাড়ীর মেয়েছেলেরা পুরাতন পদ্ধতি ছাড়িতে পারে নাই ; তাই তাহাদের আব্দারে গঙ্গা-স্নানের আয়োজন করিতে হয়। কিন্তু সে গালপোরা হাসি, সে বুকভরা উল্লাস, যাহা চোখ মুখ দিয়া ফুটিয়া ফাটিয়া বাহির হইত, তাহা ত আর নাই। কেন এমন হইল ? কেন সে বাঙ্গালীর হাসির লহর বন্ধ হইল ? কেন সে রসের প্রবাহ শুকাইল ?

অনেকবার বলিয়াছি—আবার বলিতেছি, বাঙ্গালার হিন্দুয়ানী—পরাধীন, চাকুরের ধর্ম্ম নহে। যে দিন হইতে বাঙ্গালী চাকুরী করিতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতে সামাজিকতায় এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছে। পৌষ-পার্ব্বণ কৃষকের উৎসব। ক্ষেত-ভরা ধান মরাইতে উঠিতেছে, বর্ষের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, আগামী বর্ষে অন্নাভাব থাকিবে না, অন্নের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না—এই সুখের চিন্তায় বিভোর হইয়া বাঙ্গালী কৃষক পৌষ-পার্ব্বণের আনন্দে মত্ত হইয়া উঠে। দশটা—পাঁচটা চাকুরী নাই ; পরের মন যোগাইতে হইবে না, পরের হুকুম মানিতে হইবে না—পায়ের উপর পা দিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাক, আর দুধে-ভাতে খাও—ইহাই হইল বাঙ্গালীর সুখের চূড়ান্ত। বাঙ্গালী কেবল দেবতাকে চিনে, দেবতা ছাড়া তাহার অন্য সম্বল নাই, অন্য ভরসার কেহই নাই। দেবতা বিরূপ হইলে বাঙ্গালীর দুঃখের সীমা থাকে না। পৌষ-পার্ব্বণের দিন দেবতার দয়া বুঝা যায়, তাই এই দিনে বাঙ্গালী প্রাণ ভরিয়া হাসে। কৃষী বাঙ্গালীর এ সুখ, চাকুরে কেমন করিয়া বুঝিবে ? চিরপরাধীন, বর্ষব্যাপী স্বাতন্ত্র্যের মহিমা কি বুঝিবে ? তাই পৌষ-পার্ব্বণের সে উল্লাস আর নাই। যাহারা এখনও চাষ-বাস করে, মা লক্ষ্মীর সেবা করে, তাহারা ম্যালেরিয়া-পীড়িত হইলেও, বাবু-সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও, এখনও আউনী-বাউনীর আমোদ ভুলে নাই ; মুসলমান

হইলেও তাহারা পিঠা-পুলি খায়, দশজনকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়ায়, এবং পান-ভোজনের পরম আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়। তাই এখনও গঙ্গা-স্নানে লোক যায়; এখনও পর্ব্বাহে, তীর্থক্ষেত্রে লোকের ভিড় হয়; এখন ও সমাজ-শরীরের যেটুকু সজীব আছে, সেটুকু নড়ে চড়ে হাসে খেলে।

বাঙ্গালীর জীবনের এ সুখ তুমি কি বুঝিবে বাবু? তুমি কোটি অভাব-বিজড়িত নাগপাশে বদ্ধ দুর্ব্বল জীব। তোমার সাজ-পোষাকের ভাবনা, জুতা-মোজার ভাবনা, মোটর-গাড়ির ভাবনা—তোমার ভাবনার কি শেষ আছে? যাহার এত ভাবনা, তাহার কি প্রাণে সুখ থাকে? যে বিলাসী, সে কি সুখী হইতে পারে, না অন্য দশজনকে সুখী করিতে পারে? সামাজিক সুখ বিলাসীর উপভোগ্য নহে। তুমি যখন শীতে লেপের তলায় ঘুমাইতে থাকিবে, তখন বাঙ্গালী হিন্দু হাসিতে হাসিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে গঙ্গাস্নানে যাইবে, দশজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবে, দশজনে আমোদ করিতে করিতে সাগরের জলে স্নান করিবে। সে দেশ-দেশান্তরের সন্ন্যাসী ফকীর গৃহী ত্যাগীকে দর্শন করিবে, কাঙ্গাল দুঃখীকে ভিক্ষা দিবে, নিজের পরকালের ভাবনা ভাবিবে, আর যাহার কৃপায় তাহার সংসারে সুখ উথলাইয়া পড়িতেছে, তাহার আহ্বান করিয়া জীবন ধন্য করিবে। সে সমাজ-সুখের জন্য কত কষ্ট-স্বীকার করিবে, অর্থব্যয় করিবে, দশজনকে লইয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিবে। নিজের দেহটাই ত সব নয়, নিজের দেহ-সুখই সংসারের সার-সুখ নহে। তাই বাঙ্গালী-হিন্দু পার্ব্বণ-উপলক্ষে দেহ-সুখকে অবহেলা করিয়া মনের সুখ—সমাজের সুখ অর্জ্জন করে। দেহ-সুখেই বা তুমি কোন্ সুখী হইতে পার? তোমার দেহ ত নানা রোগের আগার—ডিস্পেপসিয়া, ডিসেন্টারি, ডায়াবিটিজ আদি ড-কারাদি রোগে তুমি নিত্য জীর্ণ। তুমি পিঠা-পুলি খাইবে কেমন করিয়া? হিন্দু হইতে হইলে যেমন উপবাস করিতে শিখিতে হয়, তেমনই খাইতে এবং খাওয়াইতেও শিখিতে হয়। সে খাওয়ার রকমই বা কত! নিজে রন্ধন করিয়া, পত্নীকে অন্নপূর্ণা-রূপে উনানের পার্শ্বে বসাইয়া, খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াইতে হয়, তবে ত খাইবার আমোদ ফুটিয়া উঠিবে। হিন্দুর মতন খাইতে ও খাওয়াইতে হইলে দেহে বল চাই, জঠরে অগ্নি চাই, হৃদয়ে উল্লাস চাই। তুমি খাইবে ভাড়াটিয়া বামুনের হাতে, খাওয়াইবে ভাড়াটিয়া বামুনকে দিয়া পাক করাইয়া। তোমার বাড়ীর ভোজে কেবল অর্থগত অহঙ্কারই ফুটিয়া উঠে, অন্নপূর্ণার শ্লাঘা প্রকাশ পায় না। তুমি যেমন নিষ্কর্ম্মা বাবু—মেদ-মাংসের ঢিবি, তোমার গৃহিণীও তেমনি বিবি, বিলাসের আধার। তোমরা পরকে ডাকিয়া আনিয়া যখন খাওয়াও, তখন ভাব,

বুঝি তাহারা খাইতে পায় না। তাই তোমাদের বাড়ীতে ছেলে-মেয়ের বিয়েতে কেবল ভোজনের প্রহসন হয়; লোকে খায় না, ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারিলেই সুখ-বোধ কর।

বুঝিলে—চাকুরী করিয়া দশটা-পাঁচটা আফিসে বদ্ধ হইয়া, সাহেবীয়ানার মক্স করিয়া তোমরা বাঙ্গালীয়ানা হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছ। জীবনে সে সরল আনন্দের আদর্শ তোমাদের নাই। তোমরা খরচ করিতে জান না, করিতে পার না। তোমাদের দেহের সেবায় উপার্জিত ধন সব ব্যয়িত হইয়া যায়; পরকে খাওয়াইবে, স্বজন-পরিজন লইয়া আমোদ করিবে কি লইয়া? যদি বা আমোদ করিতে চাও, তাহা হইলে টাকার অহঙ্কার এতটা ফুটিয়া পড়ে যে মিতব্যয়ীর মতন তোমরা কোন কাজ করিতে পার না। ফলে, প্রাণভরা আমোদ-উপভোগ তোমাদের ভাগ্যে ঘটে না। সস্তার আমোদ, হিন্দুর আমোদ —পৌষ-পার্ব্বণ; চাউল, তিল, কড়াই, গুড়, মুগ আর দুধ—ইহা লইয়াই পিঠা-পুলি। কিন্তু এ পিঠা-পুলি গড়িতে জানিতে হয়, বাড়ীর মেয়েছেলের উৎসাহী হইতে হয়, তবে ত এ আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে। বাবুয়ানা না ছাড়িতে পারিলে, কৃষক না হইতে পারিলে, মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ে তুষ্ট হইতে না জানিলে, ভাগ্যে এমন আমোদ ঘটে না। বাঙ্গালার কপাল পুড়িয়াছে, তাই এমন আমোদ দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। আজ না খাওয়াইয়া খাইতে নাই—না দিয়া লইতে নাই,—ইহা যে দিন আবার শিখিবে—আবার বুঝিবে, সেই দিন পৌষ-পার্ব্বণের আমোদ আবার শতদল পদ্মের মতন ফুটিয়া উঠিবে। হায়রে, বাঙ্গালার সে হাসি—সে আমোদ কোথায় গেল?—কে হরিয়া লইল?

—বাঙ্গালী, ১৩২৬

শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চমীর বালেন্দু-গাত্রে এখনও কলঙ্ক-লেখা ফুটে নাই, হিমজাড্য-বিকাশ-কুজ্ঝটিকা এখনও অপসারিত হয় নাই, এখনও পিক-কণ্ঠের পঞ্চম তান স্বর-লহরীতে গগন-পবনকে সমান্দোলিত করে নাই, নব বসন্তের সজীবতা-প্রচারক

লোহিতাভ কিশলয়-লেখা এখনও বৃক্ষ-গাত্রে প্রস্ফুটিত হয় নাই,—কেবল একটু প্রফুল্লতার চিহ্ন প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে প্রকট হইয়াছে, ভগবান্ ভাস্করদেব ধীরে ধীরে উত্তরায়ণের পথে অগ্রসর হইতেছেন, নিসর্গসুন্দরী সাবধানে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বৃক্ষলতাগুল্মের নগ্নতা দেখাইতেছেন, আর যেন তাড়াতাড়ি সলজ্জভাবে নবকিশলয়ের চিক্কণ বসন-ধারণের চেষ্টা করিতেছেন; —এমনই সন্ধিক্ষণে,—পরিবর্ত্তনের মহামুহূর্ত্তে বাগ্দেবীর পূজা হইয়া থাকে। দেবনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, দেবলোকে সূর্য্যোদয়ের অরুণ রেখা উষার সীমন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রাতঃস্নায়ী দেবতাগণের মুখে সামগানের উদাত্ত ধ্বনিতে স্বর্গের বিহঙ্গকুল জাগিয়া উঠিয়াছে, স্বর্গের অরুণোদয় এবং জ্ঞানোদয়ের কালে বাগীশ্বরীর পূজা। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বিকাশ বলিয়াই মা আমার সবিতা-দুহিতা, বিসৃষ্টির প্রসূতি—বিকাশের দেবী। তন্ত্র বলিয়াছেন, শক্তি-বিকাশের প্রথম আস্তরণ শ্বেত; শ্বেতবর্ণ হইতেই প্রথম বিকাশ সূচিত হয়। আর ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণ সঙ্কোচের সংক্ষোভের বর্ণ। তাই মা আমার শ্বেতাম্বরা, সিতাব্জাসীনা, শশিরুচিকমলা, হংসারূঢ়া। তাই সরস্বতী ভদ্রকালী—সৃষ্টিবিতান-বিধাত্রী—গীর্ব্বাক্‌রাণী—ভারতী।

আগে শব্দ—না আগে সৃষ্টি? শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সর্ব্বাগ্রে শব্দ-ব্রহ্মের বিকাশ; সেই শব্দের কম্পন হইতে ধীরে ধীরে সৃষ্টির বিকাশ ঘটিয়াছে। তাই সৃষ্টির মূলেই বাগ্দেবী; তাই প্রথম প্রভাতেই সরস্বতীর পূজা, তাই বসন্তের প্রথম সূচনা-কালেই, সৃষ্টির নবশক্তির প্রভবন-কালেই মায়ের বোধন। এই হেতু তন্ত্র বলিতেছেন যে,—"তুমি মা ব্রহ্মার মুখ-কমলে বিরাজমানা রহিয়াছ। তুমি নিখিল জগতের প্রকাশয়িত্রী, সকল গুণময়ী, অথচ তুমি গুণাতীতা, নির্ব্বিকারা স্থূল-সূক্ষ্মের অতীতা। তুমি বিশ্বময়ী, অথচ বিশ্বের অন্তরালে নিত্য অবস্থিত রহিয়াছ। তুমি কলাতীতা নিত্যশুদ্ধ-স্বরূপা। তুমিই জীবের জড়তা বিনাশ কর এবং প্রশস্তা বুদ্ধি দান করিয়া সকলকে ধন্য কর। তুমিই বিদ্যা, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র তোমার চরিত্র গান করিয়া থাকে, শ্রুতি তোমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। তুমি শ্রী-স্বরূপা, লোকে তোমাকে ধারণা বলে; তুমি ধৃতি, মতি এবং নুতি নামে পরিচিতা, তুমি নিত্যানিত্য-স্বরূপা। তুমি চিরনবীনা, আবার অতি প্রাচীনা—সনাতনী বলিয়া খ্যাতা।"

ইহাই মায়ের পরিচয়। বুঝিলে কি, এ মা কেমন? মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্মা মায়ের স্তব করিতে যাইয়া বলিয়াছেন:—

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥"

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সংহার পর্য্যন্ত মায়ের সকল রূপই ব্রহ্মা ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছেন। গোড়ায় মা আমার মহাবিদ্যা—সরস্বতী। তাই কথাটা আরও ফুটাইবার জন্য ব্রহ্মা আবার বলিয়াছেন :—

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং ক্ষান্তিঃ শান্তিরেব চ।।"

তুমি মা শ্রী; প্রথম বিকাশের যে সৌন্দর্য্য, তাহাকেই শ্রী বলে। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে এবং অর্দ্ধোদয়ের পরে যে প্রফুল্লতা প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠে, যাহার প্রতিচ্ছবি মানবের অন্তরেও উদ্ভাসিত হয়, প্রথম অনুরাগের সেই প্রফুল্লতাকে শ্রী বলে। জগদীশ্বরী সরস্বতী মা তাই শ্রীস্বরূপিণী, সৃষ্টির প্রথম ধাত্রী। এই শ্রীর পুষ্টি হয় হ্রীর সাহায্যে।

প্রথম বিকাশের সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ যেমন পুষ্ট হইয়া থাকে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হ্রীর বা লজ্জার উন্মেষ হয়। আত্মবোধ হইলেই লজ্জার—ব্রীড়ার বিকাশ। এ রূপ, এই অসীম সৌন্দর্য্য আমার—এই বোধটুকু হইলেই হ্রীর বিকাশ হয়। সরস্বতী কেবল প্রথম বিকাশ নহে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি- ও বোধ-লক্ষণা, তাই হ্রী উহার বীজ। ঐং বিকাশের ধ্বনি; হ্রীং সেই বিকাশের পুষ্টির দ্যোতক। তাই এই দুই বীজমন্ত্রের জপে সারস্বত-আভাস সাধকের হৃদয়-পটে হইয়া থাকে। জগৎ ছাড়া আমরা ত কেহই নহি, আমরা প্রত্যেকে প্রকৃতির অঙ্গীভূত। বাহ্য-জগতে মায়ের মহালীলার প্রকটন হইলে, মনোময়-জগতেও মায়ের সেই লীলার বিস্তার ঘটিবে। বাহিরে বসন্তের প্রথম সূচনা, হ্লাদিনী-শক্তির প্রথম বিকাশ; ভিতরে মনোময়-জগতেও বাহিরের প্রতিধ্বনি হইবে, সে প্রতিধ্বনির সুর, বাহিরের সুরের সহিত মিল করিয়া লইয়া ভিতর-বাহির যখন এক সুরে বাজিবে, তখন ভিতরের মাতৃশক্তি বাহিরের জননী-শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া সাধকের আত্ম-দর্শনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। এই উদ্দেশ্যেই সাধন, ভজন, পূজা এবং উৎসব। কারণ মা যে—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতো'স্য জগন্ময়ে।।"

মা যখন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী; মা যখন এই বিসৃষ্টির সৃষ্টিরূপা এবং পালন-কার্য্যে স্থিতিরূপা, মা যখন এই জগতের জগন্ময়ী,—তখন কালে কালে,

ঋতুতে ঋতুতে মাতৃশক্তির লীলা-বিকাশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সেই পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মায়ের গতি অনুসরণ করিতে পারিলে মাতৃ-সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হইতে পারে। মা স্থূলে ও সূক্ষ্মে সমানভাবে বিরাজ-মানা; এক বৎসরে মাতৃলীলার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, যুগে যুগে, কল্পে কল্পে তেমনই পর্য্যায়-অনুসারে ভাব-বিপর্য্যয় ঘটে। তাই বর্ষকে সাধনার মানদণ্ড করিয়া ঋতুভেদে মায়ের নানা-রূপের পূজা ও আরাধনা হিন্দু করিয়া থাকেন। হেমন্তের প্রথমে শীত ঋতুর গোড়ার মা আমার শ্যামা—ঘোরা, শবাসনা, সংহার-মূর্ত্তি। আর বর্ষের প্রথমে, বসন্তের সূচনা কালে, সৃষ্টির আদিযুগে, মা আমার অমল ধবলকান্তি, শ্বেত-পদ্মাসনা, মুক্তাহার-শোভনা, হংসারূঢ়া, বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, সাধন-জগতে উত্তরায়ণের সংক্রান্তির পরদিন হইতে বর্ষ-গণনা আরম্ভ হয়। এক বৎসরে অহোরাত্র বিদ্যমান। উত্তরায়ণের কাল দিবা—বা জাগরণের কাল; দক্ষিণায়নের কাল নিশা—বা শয়নের কাল। উত্তরায়ণে মা আমার প্রফুল্লবদনা, হেমবরণী, স্মেরাননা। দক্ষিণায়নে মা আমার শ্যামা—শ্মশান-কালী—নিশা-পূজিতা মহাদেবী। উত্তরায়ণের আস্তরণ শ্বেত; দক্ষিণায়নের আস্তরণ বা আবরণ ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

মা আমার বাক্-রূপে কি কথা শুনাইতেছেন? অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ মায়ের কথা লোক-সমাজে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:—

"আমি বসুরুদ্র-গণে করি বিচরণ,
বিচরি আদিত্যে আর বিশ্বদেব-সনে;
মিত্র ও বরুণে করি আমিই ধারণ,
আমি ধরি অশ্বীদ্বয়ে ইন্দ্র-হুতাশনে॥
শত্রুহন্তা সোমদেবে আমি আছি ধরি'
আমি করি ত্বষ্টা-ভগ-পূষণে ধারণ;
হবির্দাতা সোমযাজী, দেবতুষ্টিকারী,
যজমান তরে ধরি যজ্ঞ-ফল-ধন॥
সবার ঈশ্বরী আমি, ধন-প্রদায়িনী,
আত্মজ্ঞানময়ী আমি যজ্ঞীয় প্রধানা;
বহুভাবে স্থিতা, সর্ব্বভূতাবিষ্টা আমি,
একরূপে সর্ব্বত্র দেবে করে আরাধনা॥

আমার শক্তিতে করে—যে করে ভক্ষণ,
কিম্বা করে প্রাণ-কার্য্য শ্রবণ-দর্শন;
না জানি আমায়—ক্ষয় হয় লোকগণ,
হে শ্রুত! সে তত্ত্ব কহি, করহ শ্রবণ॥
যে তত্ত্ব সেবিত নরে অমর-নিকরে,
তাহাই কহিনু এবে আমিই আপনি;
রক্ষিতে বাসনা যারে—শ্রেষ্ঠ করি তারে,
তারে করি—ব্রহ্মা, ঋষি, কিংবা তত্ত্বজ্ঞানী॥
বিনাশিতে ব্রহ্মদ্বেষী হিংস্রক অসুরে,
আমিই রুদ্রের ধনু করেছি বিস্তার;
যুঝি আমি অরি-সনে লোক-রক্ষা-তরে,
আমিই প্রবিষ্ট স্বর্গ-পৃথিবী-মাঝার॥
স্বজি আমি পিতা-ব্যোমে ব্রহ্ম-শির 'পরে,
সলিলে সাগরে আছে কারণ আমারি।
তাহা হ'তে ব্যাপি' বিশ্ব-ভুবন অন্তরে,
মায়া-দেহে স্বর্গ তাই আছি স্পর্শ করি'॥
আমিই স্বজন-কালে এ বিশ্ব-ভুবন—
ব্যাপি' নিজে বায়ু-সম হই প্রবর্ত্তিত;
অতিক্রমি' মর্ত্ত্য—স্বর্গ করি অতিক্রম,
ঈদৃশী মহিমা হয়েছিল সমুদ্ভূত॥

ইহাই দেবী-সূক্ত। এই বাণীই বাক্-মুখে প্রথম অভিব্যক্ত। ইহাই সারদার প্রথম ঝঙ্কার। ইহারই প্রতিধ্বনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ব্রহ্মার স্তোত্র। ইহারই ব্যাখ্যায় ও বিকাশে মাতৃত্বের পরিস্ফুরণ এবং বিস্তার ঘটিয়াছে। তন্ত্র এই কথাটা সাধনার পদ্ধতি-সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। সরস্বতী-পূজার দিনে এই দেবী-সূক্ত এবং বেদের ও উপনিষদের মহাবাক্যসকল পাঠ করিতে হয়।

শব্দ-ব্রহ্মের আন্দোলনে সৃষ্টির বিকাশ। তাই মা গানের দেবতা—সপ্তস্বরা, ছয়-রাগ-ছত্রিশ-রাগিণী-রূপিণী। স্বরের অন্বয় ও ব্যত্যয়ে সঙ্গীতের সৃষ্টি; সঙ্গীত ভাবের দ্যোতনা, ভাব হইতে রূপের বিকাশ। রূপই সৃষ্টি—আদ্যাশক্তির প্রকটন-লীলা। তাই মা সরস্বতী বীণাপাণি—বেণুবিদ্যা-বিধায়িনী।

আন্দোলন নর্ত্তনের নামান্তর মাত্র। স্বর নাচাইয়া সঙ্গীত, শক্তি নাচাইয়া রূপের বিকাশ। মা আমার ঊষার অরুণ-রেখায় নাচিয়া বেড়ান, তাই প্রথম

প্রভাতে দিব্যধাম উষা-রাগ-রঞ্জিত হইয়া উঠে। সূর্য্যের প্রতি দ্যুতি-কণায়, অংশুর কনক-রেখায় মা আমার নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ান, তাই আব্রহ্ম-তৃণ-স্তম্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টির সর্ব্বস্ব সমালোকিত হয়—রূপের ছটায় ফাটিয়া পড়ে। কিশলয়-বক্ষে, পুষ্প-পল্লবে, তৃণ-স্তম্বে, শীকর-সম্পাতে, ভ্রমর-পক্ষে, বিহঙ্গ-কণ্ঠে—সর্ব্বস্বে এবং সর্ব্বত্রে মা আমার নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ান—তাই সবাই সজীব, সবাই রূপময়। তাঁহার লাস্যে প্রকৃতির হাস্য বিকশিত হয়, তাঁহার নৃত্য-চঞ্চল চরণ-তাড়নে মৃত্যুর স্থবিরতা অপসারিত হয়,—বীজে অঙ্কুর উদ্‌গত হয়। তাই মা নৃত্যেরও দেবী—নটীর ঈশ্বরী। নাচে, গানে, বাক্যে, শব্দে, ভাবে মা প্রকৃতিকে হৈমজাড্যশূন্য করিয়া সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটাইয়া থাকেন। অন্তরে ও বাহিরে সমানভাবে তিনি অভিব্যক্ত—স্থূলে সূক্ষ্মে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

মা আমার বর্ণাত্মিকা, সপ্তবর্ণ-সমন্বয়কারিণী ; তাই মা শ্বেতাম্বরা, শ্বেত-বর্ণা, বালেন্দুনিভাননা। বর্ণাত্মিকা বলিয়াই মা আমার চিত্রকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আলেখ্য-রচনায় বর্ণের বিন্যাস করিতে হয় ; বর্ণাত্মিকা মায়ের কৃপা না হইলে সে বিন্যাস ঠিক-মত হয় না। তাই মা কলাবতী—কলাবধূ। তন্ত্রে তাই সরস্বতীকে কলাবধূটিকা বলিয়া আদর করিয়া ডাকিয়াছে। রূপ-বিকাশের বর্ণ যেমন শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকারের আছে ; শব্দ-বিকাশের বর্ণও তেমনি পঞ্চাশৎ প্রকারের আছে। স্বর ও ব্যঞ্জন হিসাবে পঞ্চাশটি বর্ণ ; এই বর্ণের আবার তিনটি গ্রাম আছে ; যথা গুণ্টিকা, মহাশ্বাস ও রুদ্ধশ্বাস। এই তিন গ্রামে পঞ্চাশটি মূল বর্ণের শতাষ্টক চলিত বা প্রকট রূপ আছে। মা আমার পঞ্চাশদ্‌বর্ণ-রূপিণী। মা সর্ব্ব বর্ণে পরিব্যাপ্তা হইয়া ভাষার সৃষ্টি করেন, গদ্য-পদ্যময়ী ভাষার উৎপত্তি সাধন করেন। মা স্বয়ং বাক্য এবং বাক্যের রসাত্মিকা শক্তিও বটেন। তাই মা সপ্তস্বরা, সপ্তবর্ণা, তাল-মান-রূপ-বিলাসিনী।

বসন্ত-পঞ্চমীর দিনে এই মায়ের পূজা হইয়া থাকে।

এস মা, আজ শুভদিনে শুভক্ষণে আসিয়া আমাদের হৃদয়াকাশে উদয় হও। যে বাণী শুনাইয়া বেদকে মুখর করিয়াছ, তন্ত্রকে সাধনপরায়ণ করিয়াছ,—একবার সেই বাণী শুনাও। হৃদয়-বীণার যে তন্ত্রে ঝঙ্কার দিলে অতীতের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠে, যে গীত গাহিলে বিস্মৃতির কুয়াসা দূর হয়, কৃপাময়ি, সেই তন্ত্রীতে তোমার কুন্দকলিসম অঙ্গুলি-পীড়নে ঝঙ্কার তোল, তোমার সপ্তস্বর-বিজড়িত-কণ্ঠে সেই গান গাও। মা—এ জড়তা দূর কর ; তুমি বুদ্ধি দাও, শক্তি দাও, আশা দাও, উৎসাহ দাও। আজ বাঙ্গালার বালকগণ—বিদ্যার্থিগণ

শ্বেতচন্দন-চর্চ্চিত শ্বেতকুসুমাঞ্জলি লইয়া তোমার শ্বেতচরণে অর্ঘ্য দিতেছে—তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর, তাহাদিগকে সাধক হইবার সামর্থ্য দাও, তোমার আরাধনা করিবার শক্তি দাও। আমরা চাহি বিদ্যা, চাহি বুদ্ধি, চাহি জ্ঞান, চাহি ধৃতি,—আমরা ত সুখ, ঐশ্বর্য্য, ভোগ-বিলাস চাহি না। তোমার সন্ততিগণকে রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।

—প্রবাহিণী, ১৩২০

শ্রীশ্রী৺শিবচতুর্দ্দশী

পঞ্চানন তর্করত্ন

লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা। ঈশানসংহিতা-বচনে শুনিতে পাই,—

মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামাদিদেবো মহানিশি।
শিবলিঙ্গতয়োদ্ভূতঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ।

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি মহানিশাতে দেবাদিদেব শিবলিঙ্গ-আকারে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই শিবলিঙ্গের জ্যোতিঃ কোটি সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর।

কূর্ম্মপুরাণে দেখিতে পাই,—

অতীতকল্পাবসানে তমোভূতং জগত্রয়ম্।
আসীদেকার্ণবং ঘোরং ন দেবাদ্যা নচর্ষয়ঃ।
তত্র নারায়ণো দেবো নির্জ্জনে নিরুপপ্লবে।
সংশ্রিত্য শেষশয়নং সুষ্বাপ পুরুষোত্তমঃ।
*   *   *   *
কদাচিত্তস্য সুপ্তস্য লীলার্থং দিব্যমদ্ভুতম্।
ত্রৈলোক্যসারং বিমলং নাভ্যাং পঙ্কজমুদ্‌বভৌ॥
*   *   *   *
তস্যৈবং সুচিরং কালং বর্ত্তমানস্য শার্ঙ্গিণঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবাংস্তং দেশমুপচক্রমে।

পূর্ব্বভাগ, ৯ম অঃ।

অতীতকল্পের অবসানে, দেবতা ও ঋষি-সৃষ্টির পূর্ব্বে ঘোর একার্ণব জগৎ—অন্ধকারে আবৃত। সেই অবস্থায় ভগবান্ নারায়ণ নিরুপদ্রব নির্জ্জন স্থানে

অনন্ত-শয্যায় সুপ্ত ছিলেন। লীলাময়ের লীলা-সম্পাদনার্থ তাঁহার নাভিমণ্ডলে ত্রিলোকসার অদ্ভুত দিব্য পদ্ম প্রকাশ পাইল। এই ভাবে বহুদিন তাঁহার নিদ্রাবস্থায় অতীত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপরে—

> স তং করেণ বিশ্বাত্মা সমুত্থাপ্য সনাতনম্।
> প্রোবাচ মধুরং বাক্যং মায়য়া তস্য মোহিতঃ।
> অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নির্জনে তমসাবৃতে।
> একাকী কো ভবাঞ্ছেতে ব্রূহি মে পুরুষর্ষভ॥
>
> ৯।১৩-১৪।

নারায়ণ-মায়ামোহিত বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা সনাতন নারায়ণকে কর-সঞ্চালনে প্রবোধিত করিয়া বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই নির্জন স্থানে একাকী শয়ান আপনি কে?

অতঃপর ৯ম অঃ ১৪শ শ্লোক হইতে যাহা কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগে কথিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

নারায়ণ হাস্য করিয়া বলিলেন,—আমি নারায়ণ, সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহার আমা হইতে হয়, আমাতেই সমস্ত জগৎ অবলোকন করুন এবং আমার দেহে আপনিও অবস্থিত, ইহা দেখুন।

ইহা বলিবার পরে নারায়ণ স্বয়ং বিদিত-তত্ত্ব হইলেও লীলার্থ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে?

ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি ধাতা ও বিধাতা, আমি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, সমস্ত জগৎ আমাতেই অবস্থিত।

ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার মত লইয়া যোগবলে ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে সমস্ত বিশ্ব দেখিলেন। অতঃপর তথা হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, আপনি আমার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমগ্র জগৎ অবলোকন করুন। ব্রহ্মা তদনুসারে তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত জগৎ অবলোকন করিলেন, ভ্রমণ করিয়া সীমা প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে ভগবান্ নারায়ণ যোগবলে শরীরের নব-দ্বার আবৃত করিলে ব্রহ্মা অপর নির্গম-পথ না পাইয়া সেই নাভিপদ্ম-আশ্রয়ে নির্গত হইলেন এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন—আমাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষায় আপনি শরীরের নব-দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, আপনিই একমাত্র প্রবল, আর কেহ নহে—ইহা জ্ঞাপনই ত আপনার উদ্দেশ্য ছিল?

নারায়ণ মধুর স্বরে বলিলেন,—আপনি ধাতা, বিধাতা ও স্বয়ম্ভু, আপনি লোক-পিতামহ, আপনাকে পীড়া-প্রদানে কাহার ইচ্ছা হইতে পারে? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা লীলা মাত্র,—ইহাতেও যদি আপনি আমার দোষ মনে করেন ত আপনি তাহা ক্ষমা করুন। অতঃপর আপনি পদ্মযোনি-নামে খ্যাত হইবেন এবং আমার পুত্র-স্বরূপ হইলেন। হে বিশ্বাত্মন্, আমার এই প্রিয় কার্য্য করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া বলিলেন,—আপনি এবং আমি—আমরা উভয়েই ত্রিলোকের কর্ত্তা—আমাদিগের উপর আর কেহ নাই।

ব্রহ্মার কথায় নারায়ণ বলিলেন,—আপনার যে নির্দ্দেশ, তাহা আপনার বিনাশের হেতু হইবে। আপনি যোগবলে ব্রহ্মাধিপতি প্রধান পুরুষেশ্বরকে কি দেখিতে পাইতেছেন না? আমি সেই পরমেশ্বরকে অবগত আছি। যোগীন্দ্র সাংখ্যকোবিদ্গণ যাঁহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ, আপনি সেই অনাদি-নিধন ব্রহ্মের শরণাপন্ন হউন।

ততঃ ক্রুদ্ধো'ম্বুজাভাক্ষং ব্রহ্মা প্রোবাচ কেশবম্।
ভগবন্ নূনমাত্মানং বেদ্মি তৎ পরমাক্ষরম্।
নাবাভ্যাং বিদ্যতে হ্যন্যো লোকানাং পরমেশ্বরঃ। ৪৪-৪৫।

ততো হ্যপরিমেয়াত্মা ভূতানাং পরমেশ্বরঃ।
প্রসাদং ব্রহ্মণে কর্ত্তুং প্রাদুরাসীৎ ততো হরঃ।।৫০

ব্রহ্মা সক্রোধে নারায়ণকে বলিলেন,—ভগবন্, আমি জানি আমি নিজেই সেই পরমাক্ষর পরমেশ্বর, আমাদিগের দুই জন ব্যতীত আর পরমেশ্বর পৃথক্ নাই। অতঃপর নারায়ণ-প্রদত্ত উপদেশেও ব্রহ্মার অজ্ঞান বিনষ্ট না হইলে, —ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বভূতের পরমেশ্বর—হর, অপরিমেয়াত্মা তেজোনিধি-রূপে আবির্ভূত হইলেন।

শিবপুরাণে কথা আছে,—ব্রহ্মা এবং নারায়ণ নিজ নিজ প্রাধান্য লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে পরমেশ্বর জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ-রূপে আবির্ভূত হইলেন। এই বিবরণ ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—

বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নমাবয়োর্মধ্যমদ্ভুতম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্।
শিবপুরাণ-জ্ঞানসংহিতা, ২য় অঃ।

উভয়ের (ব্রহ্মা ও নারায়ণের) বিবাদ-প্রশমনের জন্য ও তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদনার্থ আমাদিগের মধ্যস্থলে অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন, সেই জ্যোতির জ্বালামালা বহু সহস্র; তাঁহার উপমা স্তূপীকৃত কালানল।

সংহিতা ও পুরাণের একবাক্যতা করিলে, মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রজনীতে ভগবান্ শিবের আবির্ভাব-লীলার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। যথা,—রজোগুণপ্রধান ব্রহ্মা যে দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মূল প্রকৃতি; আবার সত্ত্বগুণ-প্রধান নারায়ণ যে দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মূলও প্রকৃতি। বট-বীজে যেমন সূক্ষ্মাকারে বটবৃক্ষ থাকে,—সেইরূপ ব্রহ্মার শরীরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ প্রকৃতিতে সমস্ত জগৎ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত; নারায়ণের শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রকৃতিতেও সমস্ত জগৎ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। প্রকৃতি দুই নহে, একই।—প্রবেশ-পথ ভিন্ন, এই মাত্র। প্রকৃতি ত্রিগুণা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ। ব্রহ্মার আলম্বনে প্রকৃতি-প্রবেশের পথ রজঃ, নারায়ণের আলম্বনে প্রকৃতি-প্রবেশের পথ সত্ত্ব। প্রলয়কাল অবসিতপ্রায়, কিন্তু তখনও জগৎ তমোভূত,—মাত্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর জ্ঞান-প্রকাশ—অরুণ-কিরণ-মিলিত শশিকলা-কিরীটিনী কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী-রজনীর সহিত তুলনীয়। প্রলয়ের জড়তা—প্রালেয়ের শৈত্যের সহিত তুলনীয়। প্রালেয় অর্থে তুষার। তুষারময়ী কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী-রজনী তুলনীয় সময়ে—ব্রহ্মা ও নারায়ণের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণার্থ নির্গুণ ব্রহ্মের জ্যোতির্লিঙ্গ-রূপে প্রাদুর্ভাব। সেই জ্যোতির্লিঙ্গের শব্দ-ব্রহ্ম-স্বরূপে ও প্রণব-স্বরূপে প্রকাশ ও তদনন্তর নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন শিবমূর্ত্তিতে প্রকাশ—ব্রহ্মাদি সাধকবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের জন্য।

হে লীলাময়, আজও প্রতি বৎসরে শিশিরসিক্ত কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী-রজনীতে সাধকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য প্রতি শিবলিঙ্গে বিশেষভাবে তুমি আবির্ভূত হইয়া থাক।

ভাগ্যবান্ সাধক তোমার নিরাকারে আকার-দর্শনে, অরূপে শিবরূপ-দর্শনে-প্রেম-পুলকে শিহরিয়া উঠে, ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে 'শিব শিব'-রবে, 'হর হর পার্ব্বতী-পতে'-রবে, 'গঙ্গাধর বিশ্বনাথ'-রবে দিগন্ত মুখরিত করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

—বঙ্গবাসী

দোল-লীলা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

জ্ঞান স্থির ও গম্ভীর—প্রেম চঞ্চল ও মধুর। যোগে হৃদয় স্পন্দহীন হয়, কিন্তু প্রেমের আবেগে হিয়া দুরু দুরু কাঁপে—মৃদু মৃদু দোলে। যোগের ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন, কিন্তু ভক্তের ভগবান্ প্রেমাকর্ষণ-চঞ্চল হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়া দোল-লীলা করেন। জ্ঞানবলে পরম ভাবের ভাবুক হইয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করা যায়, আবার প্রেম-ডোরে শ্রীহরিকে বাঁধিয়া আনিয়া ভক্ত-ভাবের ভাবুক করা যায়। আমি যদি কাঁদি ত আমার হরি কাঁদেন—আমি যদি হাসি ত তিনি হাসেন—আমি যদি রাগ করি ত তিনিও রাগ করেন। ভাবের হিল্লোলে আমার মন দোলে—আর মন-দোলায় বসিয়া আমার মনের মানুষ দোলেন। যিনি অসঙ্গ, তিনি আবার সঙ্গের সঙ্গী—যিনি মনের অগোচর, তিনি আবার মনের মানুষ—যিনি অচল অটল, তিনি চঞ্চল—যাঁহার চরণে কোটি ব্রহ্মাণ্ড দোলে, তিনি আজ প্রেমের টানে দোদুল্যমান। অদ্ভুত দোল-লীলা!—অদ্ভুত রহস্য।

শ্রীহরি যে কেবল ভাবের দোলায় খেলা করেন, তাহা নহে—তিনি সোহাগের বিবিধ রঙে রঞ্জিত হন। বেদান্তে বলে যে সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি অরূপ, অবর্ণ। কিন্তু আমার মন বুঝে না। অরূপের নিকটে যাইলে অরূপ হইয়া লীন হইতে হয়। তাই অরূপে রূপ দেখিতে প্রাণ বড়ই আকুল। যদ্রূপ বর্ণ-রহিত অনন্ত দিগন্ত নীলিমা-রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়—আবার সেই নীলিমা অরুণ-রাগে লোহিত-রূপ ধারণ করে—তদ্রূপ অদৃশ্য অবর্ণ ঈশ্বর প্রেম-কুঙ্কুমে রঙিন হইয়া প্রকাশিত হন। সব লালে লাল—যিনি মহান্, তিনি আবার প্রেমদুলাল। শান্ত-সমাহিত ভাব চলিয়া গিয়াছে—লাল রঙে প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে। ভক্তের ভালবাসা শ্রীহরিকে রক্তাভ করিয়া তুলিয়াছে—আর ভাবের উচ্ছ্বাসে আবার মুখশ্রীও রক্তিম হইয়াছে। রঙে রঙে মিশিয়া গিয়াছে। মনকে যে রঙে রঞ্জিত করিবে, শ্রীহরিও সেই রঙে রঙিন হইবেন। তুমি যদি কালো হও—ঠাকুরও কালো হইবেন। তুমি যদি মঙ্গল-হরিদ্রা মাখ—তিনিও পীত-বসন পরিয়া তোমার নিকট আসিবেন—তোমার যদি নিবৃত্তির নীলিমা ভাল লাগে—তিনিও নীল-কলেবর হইয়া উপস্থিত হইবেন।

এই দোল-লীলা বিশ্ব ব্যাপিয়া চলিতেছে। ধরাধামে নববসন্ত-সমাগমে এই লীলার বিশেষ ঘটা হয়। গ্রীষ্মের প্রগাড়তা নাই—বর্ষার ঝটিকা নাই—শীতের হিমপাত নাই। আবার দিক্‌সকল নির্ম্মল ও আনন্দময়। কোথা

হইতে ধীর সমীরণ ঝুরু ঝুরু বহিয়া আসিতেছে আর প্রকৃতিকে দুরু দুরু বিধূনিত করিতেছে। ঐ যে সরসী লহরী তুলিয়া নাচিতেছে আর বিকশিত কমলদলকে নাচাইতেছে, উহা শ্রীহরির দোলা। তিনি ঐ লহরী-বিকম্পিত কমল-দোলায় শ্রীচরণকমল রাখিয়া দুলিতেছেন। ঐ যে বল্লরী-বিজড়িত নব-পল্লবিত কুসুম-পরিপূরিত তরুবর অনিল-স্পর্শে মৃদু মন্দ দুলিতেছে—উহাতে তিনিই দোলায়মান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃতি হাসে আর দোলে—প্রকৃতির ঠাকুরও হাসে আর দোলে। আবার এই বসন্তে মধুর শ্যামরক্তিমা স্বভাবকে আচ্ছাদন করিয়াছে। আমার ইষ্টদেবতাও নবপল্লবদল-শ্যাম-রূপ ধরিয়া প্রেমিকের মন মোহন করিতেছেন। কুঞ্জে কুঞ্জে মালঞ্চে মালঞ্চে কতই না লালের খেলা—ও যে আমার ঠাকুরের রঙ্গ-লীলা।

এস আমরাও প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির ঈশ্বরের সঙ্গে দোল দেখি। যে ঈশ্বরকে দোলাইতে জানে না—যে তাঁহাকে রঙ মাখাইতে জানে না—সে ভক্ত নহে—সে প্রেমিক নহে। তাঁহার ভাবের ভাবুক হইলে সাগরের জল সাগরে মিশিয়া যাইবে। তাই তাঁহাকে আমার ভাবের ভাবুক করিয়া মনের দোলায় দোলাইতে হইবে। আমার হাসি-কান্নায় তাঁহাকে চঞ্চল করিব। আর অরূপকেই বা কিরূপে ভালবাসি! তাই প্রেমের রঙে তাঁকে রঙ্গাইয়া মাতোয়ারা হইব।

দে দোল, দে দোল—আজ প্রকৃতি তাহার দেবতাকে দোলাইতেছে। আমিও এই দোল-পূর্ণিমায় আমার অচল অটল অরূপ ঠাকুরকে হৃদয়-দোলায় বসাইয়া দোলাইব ও প্রেমের ফাগে—প্রকৃতির লাল রঙে—ভক্ত ভগবান্ দোঁহে লালে লাল হইয়া যাইব। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে যে যে-রূপে চাহে তিনি সেই রূপ ধরিয়া দেখা দেন। প্রেমের অনুরোধে অপরূপ রূপবান্ হন—অচল চঞ্চল হইয়া দোলেন।

পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

> দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলায়নং সকৃন্নরাঃ।
> দৃষ্ট্বাপরাধনিচয়ৈর্মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ দোলে দোলায়মান দক্ষিণমুখ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে একবার দর্শন করিয়া নিঃসংশয়ে জনগণ সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হয়।

জৈমিনি বলিয়াছেন,—

> ফাল্গুনে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহণমুত্তমম্।
> যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ।

অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে উত্তম দোলে আরোহণ করিবে, যেখানে ভগবান্ গোবিন্দ লোককে অনুগ্রহ করিবার জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

এইরূপে দোল-লীলার বিষয়ে কি পদ্মপুরাণে, কি গরুড়পুরাণে, কি স্কন্দপুরাণে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।

—সন্ধ্যা।

চড়ক-উৎসব

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত

চড়ক বৌদ্ধ-পর্ব্ব বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু চড়কের কোন বৌদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না। কেবল তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে চৈত্র মাসে দেব-দানব সাজিয়া লোকে নৃত্য, গীত ও কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি করায়, ঐতিহাসিকরা চড়ককে বৌদ্ধ-পর্ব্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে ইহা বাণ রাজার শিব-তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। মধ্যভারতের বেরারের মধ্যে বাণগঙ্গা ও পাণগঙ্গা নামে দুইটি সরিৎ একটি পর্ব্বত-তলে মিলিত হইয়া ক্রমে গোদাবরী নদীতে পতিত হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শৃঙ্গকে "খাউ" বলিয়া থাকে, উহা মাণিক দুর্গের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম এবং চান্দা নগরের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গে বাণ রাজা শিবের তুষ্টির জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, এবং ক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। যথা—প্রথমে কেবল পূজায় অভীষ্টলাভ করিতে না পারিয়া একটি বৃক্ষের নিম্নে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বৃক্ষ-শাখায় পদদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উক্ত অগ্নির উপর হেঁটমুণ্ডে ঝুলিতে লাগিলেন, শিবের কৃপায় ইহাতে তাঁহার প্রাণান্ত হওয়া দূরে থাক, কোন কষ্টই হইল না; অথচ অভীষ্টলাভ করিলেন না। ইহার অনুকরণের নাম ঝুল-ঝাপ। ইহা দিবাগমের পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়। যাহারা বাণ রাজার তপস্যার অনুকরণ করে, তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এই সন্ন্যাস করেন না।

বাণ রাজা তৎপরে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া মহাদেবের নামোচ্চারণ করিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে কণ্টকাদিপূর্ণ উপত্যকায় ঝম্প প্রদান করিলেন,

শিবের কৃপায় মরিতে পারিলেন না, অভীষ্টও সিদ্ধ হইল না। ইহাই কাঁটা-ঝাঁপ। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা বৈকালে স্নানান্তে বাদ্যভাণ্ড-সহ নিকটস্থ জঙ্গল হইতে বঁইচি ফলের কণ্টকিত ঝাড়গুলি কাটিয়া আনে এবং একটি বাঁশের ভারা বাঁধিয়া তাহার সম্মুখে স্তূপাকারে রাখিয়া লাঠির দ্বারা কাঁটা ঝাড়গুলিকে এমন করিয়া পিটিতে থাকে যে, উপরের কণ্টকগুলি ভাঙ্গিয়া বা অধোমুখ হইয়া যায় ; তৎপরে একে একে ভারার উপর হইতে মহাদেবের নামোচ্চারণ করিয়া সেই বঁইচির ঝাড়গুলির উপর পড়িতে থাকে।

বাণ রাজা শিবের উদ্দেশে প্রাণ-দানের জন্য তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র পৃথিবীতে বিদ্ধ করিয়া বৃক্ষ-শাখা হইতে তদুপরি পতিত হইলেন, অথচ প্রাণ বাহির হইল না, অভীষ্টও অপূর্ণ রহিল। ইহার অনুকরণ বঁটি-ঝাঁপ ; কাঁটা-ঝাঁপের পরদিন ইহা করিতে হয়, ঐ দিন অপরাহ্নে সন্ন্যাসীরা স্নানান্তে কতকগুলি নূতন বঁটি (তাহাতে কিছুমাত্র ধার থাকে না) মাথায় করিয়া আনিয়া ঝাঁপের ভারার নিম্নে রক্ষা করে, একটা বৃহৎ থলিয়া খড় পূর্ণ করিয়া ঐ বঁটিগুলি সারি সারি তাহার উপর পাতিয়া জনকয়েক লোক থলিয়াটি ধরিয়া থাকে ; সন্ন্যাসীরা ভারার উপর হইতে "মহাদেব"-নাম উচ্চারণ করিয়া তদুপরি পতিত হয়। উপরোক্ত তিনটি ঝাঁপের পূর্ব্বে শিবের অনুমতি লইতে হইত। অনুমতি লওয়ার প্রথা এইরূপ, সন্ন্যাসীরা শিবের ঘরের সম্মুখে বসিয়া মাথা ঘুরাইতে থাকে, ইহাকে মাথা-চালা বলে, সেই সময় পূজারি ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতর শিবের মস্তকে ফুল, গঙ্গাজল চড়াইতে থাকেন। যতক্ষণ না শিবের মাথার ফুল পড়িয়া যায়, ততক্ষণ সন্ন্যাসীরা প্রাণপণে মাথা চালিতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কাহারও কাহারও মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িত। লোকে বলিত, এই ব্যক্তি গোপনে সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়াছে। কোন কোন সন্ন্যাসী অচেতন হইয়া পড়িত, কেহ বা অচেতন হইয়া নানাপ্রকার বকিতে আরম্ভ করিত। ইহার উপর শিবের ভর হইয়াছে বলিয়া অনেকে তাহার পদধূলি লইত, মাথায় গঙ্গাজল দিত, এবং ভক্তি করিত। সে ব্যক্তি নানাপ্রকার ভূত-ভবিষ্যতের কথা বলিয়া শ্রোতাদিগকে ত্রস্ত করিয়া দিত। অনেক পরিচিত পরিবারের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল-বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে বর্ণন করিয়া সেই পরিবারের প্রতি দেবাভিশাপের ভয় দেখাইত, কখন বা মূল সন্ন্যাসীর কখন বা যে-বাবুর চড়ক, সেই বাবুর দোষের কথা তুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিত। তখন সন্ন্যাসীদল বাবুর নিকটস্থ হইয়া, কখন বা তাঁহাকে ধরিয়া কখন বা কৃত্রিম বন্ধন করিয়া শিবের সম্মুখে উপস্থিত করিত। বাবু উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক আত্ম-অপরাধের জন্য বিবিধ স্তুতি-মিনতি করিতেন ; দণ্ড স্বীকার করিলে শিবের মাথা হইতে

ফুলে পড়িত। তখন সন্ন্যাসীরা বাদ্যসহ নৃত্য করিতে করিতে "তারকেশ্বরের শিবো মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করিয়া ঝাঁপের নিকট উপস্থিত হইত।

কঠোর সাধক বাণ রাজা নিরস্ত না হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষে পৃষ্ঠদেশে বাণ বিদ্ধ করিয়া উহা বৃক্ষ-শাখায় বান্ধিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তখন সদাশিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর দান করিয়াছিলেন।

কলিকাতার সন্ন্যাসীরা অতি প্রত্যুষে কালীঘাটে গিয়া বাণ ফুড়িয়া আসিত। অন্যান্য কালাস্থানেও বাণ ফোঁড়ার রীতি প্রচলিত ছিল। আমরা হুগলি-কুড়িয়ার বাবু শিবচন্দ্র গুহের কালী-বাড়ীতে একটি লোকের জিহ্বা ফুঁড়িতে দেখিয়াছিলাম। একদল সন্ন্যাসী আসিয়া উক্ত কালী-বাড়ীতে উপস্থিত হইলে চারিদিক্ বাদ্যভাণ্ডে পূর্ণ হইল, একজন ব্রাহ্মণ scratchএর মত একখানি অস্ত্র আনিয়া জনৈক সন্ন্যাসীর জিহ্বাখানি টানিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিয়া দিল। সন্ন্যাসী থুথুর মত খানিকটা শোণিত ফেলিয়া দিয়া, অগ্রভাগ-সূক্ষ্ম ৪।৫ হস্ত দীর্ঘ এক লৌহ-শলাকা তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হইত। এই সকল গাজনের দল কালীঘাট হইতে বাহির হইয়া সহরের পথে পথে, ভদ্র-লোকের গৃহে গৃহে, প্রত্যেক ঠাকুর-বাড়ী ও শিব-মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিত। ঢাক ইহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র, অন্যান্য বাদ্যও থাকিত। দুইটী বালককে হর-গৌরী সাজান হইত, এই হর-গৌরীর সঙ্গে বহু ব্যক্তি অনেক রকম সং সাজিয়া পথে রঙ্গ-ভঙ্গ করিত। তন্মধ্যে জেলেপাড়া ও কাঁসারীপাড়ার সং দেখিবার জন্য চিৎপুর রোড ও যে যে পথ দিয়া তাহারা প্রতি বৎসর যাইত, সেই সকল রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইত। প্রত্যেক গৃহের ছাদ বা রাস্তা ও জানালায় তিলার্দ্ধ স্থান থাকিত না।

গাজনের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে হাড়ী, মুচি, বাগদী প্রভৃতি ইতরজাতীয় লোকেরাই বাণ ফুঁড়িত, উপবীতের ন্যায় এক গোছা সূতা গলায় পরিধান করিত। সে সময় বহু ব্যক্তি তাহাদিগকে প্রণাম করিত। এমন কি, অনেকে মূল সন্ন্যাসীর পদধূলিও গ্রহণ করিত,—অতি আদরের সহিত তাহাদিগকে ভোজন করাইত। তাহারা লৌহ-শলাকা ভিন্ন বাহুতে ছিপ, বাঁশ পুরিয়া নৃত্য করিত, কোন কোন সন্ন্যাসীকে ক্ষত ছিদ্রে সর্প পুরিয়া রাখিতেও দেখা গিয়াছে। উদরের উভয় পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া দুই ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্র বাণ বিদ্ধ করিয়া অগ্রভাগে ঘৃত-সিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া

অগ্নি সংযোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে ধুনা প্রজ্বলিত করা হইত, ইহাকে দশলকি বাণ বলিত। এই বাণ বালক-সন্ন্যাসীরা ফুঁড়িত। দুই গাছি দড়ির উভয় মুখ দুই জন লোকে ধরিয়া থাকিত, একদল বালক-সন্ন্যাসী আপনাদিগের উদরের উভয় পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে উক্ত রজ্জু প্রবেশ করাইয়া সারি বাঁধিয়া নৃত্য করিত। কণ্ঠনলির সম্মুখের চর্ম্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে তরবারি বা ছোরা বিদ্ধ করিয়া রাখিত।

শেষদিনে চড়ক। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বাণফোঁড়া বন্ধ করায় চড়ক অগত্যা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবুও দুই এক স্থানে বাণ না ফুঁড়িয়া যতদূর হইতে পারে, তাহা হয়। তন্মধ্যে ফরিদপুর জেলায় কোটালীপাড়া এবং কলিকাতায় সাতুবাবুর মাঠে চড়ক-গাছে ঘুরান হয় দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে যে সন্ন্যাসী চড়ক-গাছে ঘুরিত, তাহাদের পৃষ্ঠে দুইটি মোটা মোটা বড়শি বিদ্ধ করিয়া রজ্জু-যোগে তুলিয়া পাক দেওয়া হইত। সে সময় তাহার কষ্টের কথা বর্ণনাতীত, কিন্তু সে ব্যক্তি কোন প্রকার কষ্ট প্রকাশ করা দূরে থাকুক, নানা প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী ও ব্যঙ্গ-পরিহাস করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। সেইজন্য "চড়কীর হাসি" প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। পিঠের চামড়া ছিঁড়িয়া সময়ে সময়ে সন্ন্যাসী পড়িয়া মারা যাইত। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ঐরূপ মৃত্যু-নিবারণ-জন্য পৃষ্ঠে ছিদ্রের উপর একখানি গামছা বাঁধিয়া চড়ক-গাছে তুলিবার নিয়ম করায় অনেক উপকার হইয়াছিল, কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপারে কত সন্ন্যাসী যে শেষে ধনুষ্টঙ্কার-রোগে মারা যাইত, তাহার সংখ্যা নাই।

বাগুয়া বাজার অর্থাৎ বাগবাজারের ঘোল চড়কী কলিকাতায় সর্ব্বপ্রধান বিখ্যাত চড়ক ছিল, বাগবাজার ষ্ট্রীটের এখন যেখানে মৃত বাবু নন্দলাল বসুর বাটী, তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এই চড়ক হইত। ইহাতে চড়ক-গাছের গাত্রে উপর উপর করিয়া চারিটী মাচান বাঁধিয়া সর্ব্বোচ্চ মাচানের মধ্যস্থলে একজনকে মহাদেব সাজাইয়া বসান হইত, আর প্রত্যেক মাচানের প্রত্যেক কোণে একজন করিয়া ১৬ জন লোকের পিঠ ফুঁড়িয়া ঝুলাইয়া দিয়া ঘুরান হইত। কিন্তু দু চড়কীগুলি যেমন বেগে ঘুরিত, ঘোল চড়কী তেমন ঘুরিত না। এই চড়ক-গাছটী সংবৎসর পেরিংস্ উদ্যানের বৃহৎ পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত থাকিত। ইহা রামধন ঘোষের চড়ক, অনুমান ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই চড়ক বন্ধ হইয়াছে।

—নব্যভারত, ১৩১০

———

চড়ক-সংক্রান্তি

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বলে, সৃষ্টির মধ্যে পুরাতন কিছু নাই। তাই ভক্ত কবি গাহিয়া গিয়াছেন—

নব নবরে নিতুই নব।

অর্থাৎ, এ সংসার নিত্য নবীনতার আকর। এখানে যাহা পুরাতন, তাহা তিষ্ঠিতে পারে না, একেবারেই লোপ পায়। মনুষ্য-দেহ নিত্য নূতন হইতেছে। বৃক্ষ-গুল্ম-লতা নিত্য নবীনতা ধারণ করিতেছে। সৃষ্টি-শক্তি অনবরত নূতনকে লইয়াই খেলা করিতেছে। আর এই নূতনতার মধ্যে নব নটবর নিতুই নব নব লীলার প্রকাশ করিতেছেন।

যদি সবই নূতন, তবে ইহার মধ্যে পুরাতন কি? পুরাতনের বোধটা যে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে রহিয়াছে। কেমন করিয়া সে জ্ঞানটি হইল? ঐ বৈষ্ণব-শাস্ত্রই উত্তর করিতেছেন যে, এই নূতন সৃষ্টির নবীন লীলার মধ্যে আমিই পুরাতন। এই আমার আমিত্ব-বোধটাই সনাতন। আমি আছি, আমি ছিলাম, আমি থাকিব—এই জ্ঞান হইতেই কালের পরিমাণ, এই জ্ঞান হইতেই পুরাতনের বোধ। আমি যখন লীলাময় তখন "নব নবরে নিতুই নব।" তখন প্রতি পলে প্রতি ক্ষণে আমা হইতে নবীনতার প্রস্রবণ যেন ছুটিয়া বাহির হইতে থাকে। তখন পুরাতনের বোধও থাকে না, পুরাতনের ভাবনাও থাকে না। কিন্তু যখন আমি আছি, এই জ্ঞানটা ফুটিয়া উঠে, আমার আমিত্বের সনাতন তত্ত্বটা যখন বুঝিতে পারি, তখন পুরাতন ছাড়া, কেবল অতীত কালের বোধ ছাড়া অন্য অনুভূতি মনে লাগে না। এমন অনুভব হইলে সৃষ্টি-রক্ষা সম্ভবপর হয় না। তখন মনে হয় আমি নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নিরালম্ব সত্য-স্বরূপ। তখন মনে হয় জগতের এ লীলা মায়া, ইহা যাদুকরের ইন্দ্রজালমাত্র। তাই সমাজ-রক্ষার জন্য মানুষকে কর্ম্মী করিবার উদ্দেশ্যে পুরাতনে ও নূতনে পর্য্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মালা জপ কর ত? একবার মালাটা ঘুরাইলে পর, হিসাব রাখিবার উদ্দেশ্যে মাটীর উপর একটা যব রাখিয়া দিতে হয়। এমনি করিয়া কেহ শত যব মালা করে, কেহ বা সহস্র যব মালা ঘুরায়। মনুষ্য মাত্রেই অহরহঃ তেমনই স্মৃতির মালা ঘুরাইতেছে। কাল কি ছিল, আজ কি হইল, আগামী কল্যই বা কি হইবে, এই চিন্তার মালা মানুষের মনে অহরহঃ ঘুরিতেছে। একবার

সে মালা ঘুরান শেষ হইলে, একটা বর্ষ শেষ হইল মনে করিতে হয়। ইংরেজের পুরাতন বর্ষ শেষ হয় ৩১শে ডিসেম্বরে।

আমাদের পুরাতন বর্ষ শেষ হইল আজ চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে। এই দিনই অজ্ঞাত ভবিষ্যতের বক্ষে একটা আশার যব রাখিতে হয়। যেন কাল হইতে সব নূতন হইবে, নূতন বর্ষ, নবীন আশা, নবীন উদ্যোগ, সবই যেন নূতন হইবে। তাই আজ পুরাতনের শেষ, কাল নবীনতার সূচনা। জীবনটাকে স্বাদু করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এক একটা উৎসব, এক একটা পূজা, এক একটা জন্মতিথি যেন নূতনের সূচক ও প্রবর্ত্তক হইয়া আমাদিগকে একটু সজ্ঞান করিয়া তোলে। তাই এই সকল দিনকে "বৎসরকার দিন" বলা হয়। অর্থাৎ, এই সকল আমাদের জীবন-প্রবাহের যেন এক-একটা ছেদ, এক একটা পুরাতন অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং নূতনের সূচনা। তাই ত বলিয়াছি, জীবনকে স্বাদু করিবার জন্য—আশার বাসা উজ্জ্বলতর করিবার উদ্দেশ্যে এই সব নির্দ্দেশ হইয়া থাকে।

মনে করিতে জানিলে—আজ কত কথা মনে পড়িবে। ১৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে, এই ভারতবর্ষে বা বঙ্গদেশে কে যেন কেমন একটা মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কে জানে সে কি কীর্ত্তি করিয়াছিল, তখন কে জানে কেমন সমাজ, কেমন মানুষ, কেমন মনুষ্যত্বের উন্মেষ, কেমন কর্ম্ম, কেমন নীতি ও প্রাণ ছিল যে তাহার পর হইতে আমরা এই ১৩২৭ বৎসর কেবল বর্ষ গণনা করিয়াই আসিতেছি। সে মোহানা হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা মনে আছে কি? রাজপুত, মোগল, পাঠান, মারহাট্টা, শিখ কত এল, কত গেল। কত সুখ, কত দুঃখ, কত মন্বন্তর ভোগ করিলাম, হয়ত বা তাহাদের বেদনা-লেখাও মুছিয়া গিয়াছে! কিন্তু তবু গণিতেছি। এই ইংরাজ-আমলেই দেড় শত বৎসর গণিলাম। গণিয়া করিলাম কি? গণিয়া স্মারক যবের হিসাবও কি মনে আছে?

তাই প্রগাঢ় রসবিৎ হিন্দুগণ আজ চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সংসারের সং বাহির করিয়া থাকেন। এ যে কেবল সংএর খেলা, এ যে কেবল ব্যঙ্গ, কেবল বিদ্রূপ, নিয়তির সহিত কেবল উপহাস, সেইটুকু বুঝাইবার জন্য আজ সংক্রান্তির সং যোটান হয়। দেখ দেখ, ঐ অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল-স্বরূপ চড়ক-দণ্ডের চক্রের উপর দড়ি বাঁধিয়া কত লোকে ঘুরিতেছে। কেহ পিঠ ফুঁড়িয়াছে, কেহ জিভ্ ফুঁড়িয়াছে, কেহ বা হস্ত-পদ বদ্ধ হইয়া কেবল ঘুরিতেছে। দে-পাক, দে-পাক, কেবল পাক দিতেছে, আর পাক খাইতেছে। ১৩২৭ পাক আমরা খাইলাম। কখন বা পিঠ ফুঁড়িয়া, কখনও বা জিহ্বার উপর লাগাম দিয়া, কখনও বা হস্ত-পদ

বদ্ধ করিয়া, স্থবির নিশ্চেষ্ট হইয়া বিহ্বল বিভ্রান্তভাবে কত ঘুরিলাম বল দেখি? ঐ কালের অবতার-স্বরূপ অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল-স্বরূপ মহাকাল রুদ্রের সম্মুখে এ চড়ক-লীলা ত অহরহঃই আমরা করিতেছি। অভিনয় করিয়া দেখাইলেও কি বোধ হইতেছে? যাহার হয় সে-ই মজে, আর সে-ই এই সৃষ্টির মধ্যস্থ কীলক-স্বরূপ সনাতন পুরুষকে ধরিতে চেষ্টা করে।

সে ভাবনা আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমরা স্রোতের কুটা-স্বরূপ কেবল ভাসিয়াই যাইতেছি। আমরা এই লীলাময় সংসারের লীলাময়ের নবীনতাটাই আস্বাদন করিতে উৎসুক। চিনি খাইতে চাই, চিনি হইতে চাই না। পুরাতন হইলেও পুরাতনের সহিত মিশিতে চাই না, কেবল যিনি "নব নবরে নিতুই নব" তাঁহার নবীনতার অপূর্ব্ব লীলার মধুর আস্বাদ এ জীবনে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইতে চাই। কে বলিল, আমরা বুড়া? কে বলিল, আমরা অতি বৃদ্ধ, অতি প্রাচীন হিন্দু জাতি? আমাদের দেবতা যে নিত্য নব, নিতুই নব। তাঁহার দেহে পুরাতনের লেশমাত্র নাই।

—নায়ক, ১৩২৫